পদাবলী-মাধুর্য্য — প্রচ্ছদ

দীনেশচন্দ্র সেন

প্রকাশ কালঃ ১৯৩৭

Made with 💖 by টেলি বই 🇮🇳

✅ t.me/bongboi

এ ধরনের আরও বই পান ⏩ এখানে।

😺 Generated from WikiSource

1. শিরোনাম
2. পদাবলী-মাধুর্য্য — প্রচ্ছদ
3. প্রথম পরিচ্ছেদ
4. দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
5. তৃতীয় পরিচ্ছেদ
6. চতুর্থ পরিচ্ছেদ
7. পঞ্চম পরিচ্ছেদ
8. ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
9. সপ্তম পরিচ্ছেদ
10. অষ্টম পরিচ্ছেদ
11. নবম পরিচ্ছেদ
12. দশম পরিচ্ছেদ
13. একাদশ পরিচ্ছেদ
14. দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
15. ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
16. চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
17. পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
18. ষোড়শ পরিচ্ছেদ
19. সপ্তদশ পরিচ্ছেদ
20. অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ
21. সম্পর্কে

1. পদাবলী-মাধুর্য্য — প্রচ্ছদ
2. সম্পর্কে

পদাবলী-মাধুর্য্য

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা।।"

রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর ডি-লিট্

প্রকাশক—
শ্রীরাধারমণ চৌধুরী বি-এ
প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস
৬১নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিন্টার—শ্রীফণিভূষণ রায়
প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৫২।৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

পাঁচ সিকা

বঙ্গদেশের শিক্ষিতা মহিলাগণের মধ্যে যিনি কীর্ত্তন প্রচার করিয়া এদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদের প্রতি পুনরায় তাঁহাদের আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিয়াছেন, জাতীয় জীবনের সেই অগ্রগামিনী পথপ্রদর্শিকা সুর-ভারতী শ্রীমতী অপর্ণা দেবীর কর-কমলে স্নেহের সহিত এই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম।

শ্রী দীনেশ্চন্দ্র সেন

ভূমিকা

এই পুস্তকের শেষ কয়েক ফর্ম্মা যখন ছাপা হয়, তখন আমি কলিকাতায় ছিলাম না। শেষের দিকটার পাণ্ডুলিপি আমি ভাল করিয়া দেখিয়া যাইতে পারি নাই। এজন্য সেই অংশে বহু ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্ট হইবে। যদি এই পুস্তকের পুনরায় সংস্করণ করিতে হয়, তখন সেই সকল ভুল থাকিবে না, এই ভরসা দেওয়া ছাড়া এ সম্বন্ধে আর কিছু বলা এখন আমার পক্ষে সম্ভব নহে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

সাঙ্কেতিক শব্দ

চ—চণ্ডীদাস
শে—শেখর
ব—বলরাম দাস
রা—রাম বসু
কৃ—কৃষ্ণকমল গোস্বামী
রায়—রায় শেখর
বৃন্দা—বৃন্দাবন দাস

পরিচ্ছেদসমূহ (মূল গ্রন্থে নেই)

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ
চতুর্থ পরিচ্ছেদ
পঞ্চম পরিচ্ছেদ
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
সপ্তম পরিচ্ছেদ
অষ্টম পরিচ্ছেদ
নবম পরিচ্ছেদ
দশম পরিচ্ছেদ
একাদশ পরিচ্ছেদ
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ
ষোড়শ পরিচ্ছেদ
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

আমার বয়স যখন ১৩ বৎসর, তখন আমার পিতার পুস্তকশালায় চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির একখানি ছাপা পুঁথি আমি পাইয়াছিলাম, ইহা ১৮৭৮ সনের কথা। পিতা ইংরেজীনবীশ এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিলেন। সেকালের ব্রাহ্ম-মতাবলম্বীরা চৈতন্য-ধর্ম্মের, বিশেষ করিয়া বংশীধারী কৃষ্ণের বিদ্বেষী ছিলেন। তথাপি আমাদের ঢাকা জেলায় কৃষ্ণকমল গোস্বামী তাঁহার 'রাই-উন্মাদিনী' ও 'স্বপ্ন-বিলাস' যাত্রায় কৃষ্ণ-প্রেমের যে বন্যা বহাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা তথাকার ব্রাহ্মদিগের আঙ্গিনায়ও ঢুকিয়াছিল,—পৌত্তলিকের এই বৈপ্লবিক অভিযান তাঁহাদের নিরাকার চৈতন্য-স্বরূপ ব্রহ্ম-ব্যূহ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই।

আমাদের বাড়ীতে বৈষ্ণব-ভিখারীরা আনাগোনা করিত এবং পিতামহাশয় কখনও কখনও সেই ভিখারীদের মুখে "শুন ব্রজরাজ, স্বপনেতে আজ, দেখা দিয়ে গোপাল কোথায় লুকালো" ইত্যাদি গান শুনিতে ভালোবাসিতেন। আমি সেই কিশোর বয়সে নিবিষ্ট হইয়া সারেঙ্গের সুরের সঙ্গে গায়কের কণ্ঠস্বরের আশ্চর্য্য মিল ও একতান ঝঙ্কার শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম। সারেঙ্গ নানা লীলায়িত ছন্দোবন্ধে কখনও ভ্রমরগুঞ্জনের মত, কখন অপ্সরী-কণ্ঠ-নিন্দিত সুরে বিনাইয়া বিনাইয়া—মিষ্ট মৃদু তানে "ঋ-ঋ" করিয়া কানে মধু ঢালিয়া দিত, সেই সঙ্গে

"আহা মরি, সহচরি, হায় কি করি, কেন এ কিশোরীর সুশর্ব্বরী প্রভাত হ'ল"-

পদের "রি"গুলি যে কি অদ্ভূত সঙ্গত করিত, তাহা আমি বুঝাইতে পারিব না, মনে হইত, যেন কবি কৃষ্ণকমল কণ্ঠস্বর ও সারেঙ্গের এই অপূর্ব্ব একতান সঙ্গত করিবার জন্যই এই পঞ্চ 'রি'-রণিত পদটি রচনা করিয়াছিলেন, গানটি যেন সারেঙ্গের মর্ম্মান্ত করুণ সুরের সঙ্গে বিলাপ করিতে থাকত।

আমি ইহাও পূর্ব্ব হইতে বৈষ্ণব-পদের অনুরাগী হইয়াছিলাম আমার অষ্টম বৎসর বয়সে একদিন এক বৃদ্ধ বৈরাগী তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্রকে কৃষ্ণ সাজাইয়া একতারা বাজাইয়া মিলিত-কণ্ঠে

"যদি বল শ্যাম হেঁটে যেতে চরণ ধূলায় ধূসর হবে,
গোপীগণের নয়নজলে চরণ পাখালিবে।"

গাহিতেছিল, সেই আমার প্রথম মনোহরসাই গান শোনা। আমার মনে হইয়াছিল, স্বর্গের হাওয়া আসিয়া আমার বুক জুড়াইয়া গেল;—কেহ যেন এক মুঠো সোণা

দিয়া আমাকে আশীষ করিয়া বলিয়া গেল, “এই তোকে রত্নের সন্ধান দিয়া গেলাম।”

এই ঘটনার কিছুদিন পরে মাণিকগঞ্জের বাজারের অনতিদূরে দাসোরার খালের কাছে এক চতুর্দ্দশ বৎসর-বয়স্কা রমণী গাহিতেছিল—

“কত কেঁদে মর্‌বি লো তুই শ্যাম অনুরাগে—
নব-জলধররূপ বড় মনে লাগে—
ভেবেছিলি যাবে দিন তোর সোহাগে সোহাগে”—

একটা খোলা জায়গায় বাজারের লোকেরা সতরঞ্চি পাতিয়া আসর তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিল; বহু শ্রোতা—কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বসিয়া গান শুনিতেছিল। আমার সেই আট বৎসর বয়সের কথা এখনও মনে আছে। রমণীর বর্ণ গাঢ় কৃষ্ণ, তদপেক্ষা গাঢ়তর কৃষ্ণ কোঁকড়ান কুন্তল পুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমরের মত তাহার পৃষ্ঠে ও কর্ণান্তে দুলিতেছিল,—সেই কৃষ্ণবর্ণের মধ্যে একটা লাবণ্য ও তাহার সুরে একটা আপনা-ভোলা আবেশ ছিল, তাহা আমি এখনও ভুলিতে পারি নাই—কালেংড়া রাগিণীর চূড়ান্ত মিষ্টত্ব দিয়া সে গাইতেছিল “ভেবেছিলি যাবে দিন তোর সোহাগে—সোহাগে”—এখনও সেই নীল-বরণী নবীনা রমণীর কণ্ঠস্বরের রেশ কখনও কখনও আমার কানে বাজিয়া ওঠে। সে আজ ৬২ বৎসরের কথা; যে তিন ছত্র পদ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা তখনই শুনিয়াছিলাম, তাহা আর শুনি নাই। কত বড় বড় ঘটনা—সুখ-দুঃখ—এই দীর্ঘকাল জীবনের উপর বহিয়া গিয়াছে, তাহাদের স্মৃতি ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে; কিন্তু সায়ংকালে সরিৎস্পৃষ্ট মলয়ানিলে আন্দোলিত নিবিড়-কেশদামশোভিতা নীলোৎপল-নয়নার আকুল কণ্ঠের সেই অসমাপ্ত গীতিকা আমি ভুলিতে পারি নাই। আমার স্মৃতিশক্তি প্রখর, কেহ কেহ এরূপ মন্তব্য করিতে পারেন; কিন্তু তাহা নহে। ঐ পদে আমার প্রাণ যাহা চায় তাহা পাইয়াছিল, এজন্য স্মৃতি তাহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে। আমি স্মৃতি অর্থে বুঝি ভালবাসার একটা প্রকাশ; কষ্ট করিয়া রাত জাগিয়া পড়া মুখস্থ করিলে যাহা আয়ত্ত হয় তাহা স্মৃতির ব্যায়ামমাত্র—উহা স্মৃতির স্বরূপ নহে। সন্তান-হারা জননী বিনাইয়া বিনাইয়া মৃত শিশুর জীবনের কত খুঁটি-নাটি কথাই বলিয়া বিলাপ করিয়া থাকেন, শ্রুতিধর কোন স্মার্ত্ত পণ্ডিতেরও হয়ত এত কথা মনে থাকিত না। যাহা ভালবাসা যায়, তাহাই স্মৃতির প্রকৃত খোরাক, তাহা একবার শুনিলে বা দেখিলে আর ভোলা যায় না।

গোড়ায় সুরু করিয়াছিলাম চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির মুদ্রিত পুস্তকের কথা লইয়া। বাবার আল্‌মারীতে জন্‌সনের র‍্যাম্‌ব্লার, এডিসনের স্পেক্‌টেটার ও

থিওডোর পার্‌কারের গ্রন্থাবলীর মধ্যে শিক্ষিত-সমাজের অবজ্ঞাত এই চণ্ডীদাসের পদাবলী কি করিয়া স্থান পাইল? আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, বৈষ্ণবগায়কের মুখে দুই একটি ‘স্বপ্ন-বিলাসে’র গান শুনিয়া প্রীত হইলেও, পিতৃদেব চণ্ডীদাসের পদ কখনও পড়েন নাই—তথাপি চণ্ডীদাসের পদাবলী তাঁহার আল্‌মারীতে প্রবেশ করিল কি সূত্রে?

বৈষ্ণব-চূড়ামণি স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় এই পুস্তকখানি সম্পাদন করিয়াছিলেন; শিক্ষিত-সমাজে চণ্ডীদাসের এই সর্ব্ব-প্রথম আবির্ভাব। ভদ্র মহাশয় উত্তর-কালে ত্রিপুরার গভর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষিক হইয়াছিলেন; তখন সেইখানে আমি কতকদিন পড়িয়াছিলাম—কিন্তু পিতৃদেবের সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল না। ঢাকা জেলার মত্ত গ্রামবাসী স্বর্গীয় উমাচরণ দাস মহাশয় পিতৃদেবের দূর সম্পর্কে আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। উমাচরণ দাসের মত ইংরেজী-সাহিত্যবিৎ পণ্ডিত এবং সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি তখন পূর্ব্ববঙ্গে কেহ ছিলেন না। ভদ্র মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত চণ্ডীদাসের ভূমিকায় বিশেষ করিয়া ইঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, উমাচরণবাবু তাঁহার অগ্রজপ্রতিম ছিলেন এবং তাঁহার পূর্ণ সাহায্য ভিন্ন তিনি পুস্তকখানি সম্পাদন করিতে পারিতেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, উমাচরণবাবু সেকালের ইংরেজী-জানা শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় হইলেও, গ্রাম্যকবি চণ্ডীদাসের অনুরাগী ছিলেন। পিতামহাশয়কে উমাচরণবাবুই চণ্ডীদাসের পদাবলী উপহার দিয়া থাকিবেন।

এইভাবে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় এবং পদাবলী-সাহিত্যে আমার প্রথম প্রবেশ। আমি বইখানি আদ্যন্ত পড়িলাম। ১২।১৩ বৎসর বয়সেই আমি বাইরণ ও শেলীর কাব্য, এমন কি মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট লইয়াও নাড়াচাড়া করিতাম। আমার শিক্ষক পূর্ণচন্দ্র সেন আমাকে বিদ্যাপতির পদ পড়িয়া শুনাইতেন। তিনি প্রথমতঃ ব্রাহ্ম ছিলেন, তার পর উল্টা খোঁজ দিয়া একবারে গোঁড়া হিন্দু হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম আমাকে বলেন—এই বৈষ্ণব-কবিদের ভাব আধ্যাত্মিক জীবনের গূঢ় রহস্যপূর্ণ। তিনি অবশ্য বৈষ্ণব-কবিদের ভাব কতকটা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, কারণ “নিজ করে ধরি দুঁহু কানুক হাত। যতনে ধরিল ধনি আপনার মাথ” প্রভৃতি পদ পড়িতে পড়িতে তিনি আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। কিন্তু স্কুলে ছিলেন শাক্তের অবতার—সাক্ষাৎ মায়ের মূর্ত্তি; আমরা সকলেই তাঁহার প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়াছি।

কৈশোরান্তে যখন আমার জীবনে নব অনুরাগের ছোঁয়াচ লাগিয়াছিল, তখনও বৈষ্ণব পদ আমি ভোগের রাজ্যের অভিধান দিয়া বুঝি না—ইহা পূর্ণবাবুর কৃপায়।

২।   “এ কথা কহিবে সই এ কথা কহিবে”

আমি নিবিষ্ট হইয়া চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়িতাম।—বটতলার পদকল্পতরু কিনিয়া লইলাম। ধীরে ধীরে এই গানটিতে আমার মনে একটা নূতন রাজ্যের দরজা খুলিয়া গেল:—

“এ কথা কহিবে সই এ কথা কহিবে,
অবলা এমন তপঃ করিয়াছে কবে?
পুরুষ-পরশমণি নন্দের কুমার,
কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার।”

তিনি স্পর্শ-মণি, যাহা ছুঁইয়া ফেলেন, তাহাই সোণা হইয়া যায়; এমন ধনী তিনি, কুবেরও তাঁহার কাছে ধন প্রার্থনা করেন, সেই কৃষ্ণ কি ধনের প্রত্যাশায় আমার পা ধরিয়া থাকেন, সখীগণ তোমরা বল, আমার মত তপস্যা কে করিয়াছে?—এরূপ অসাধনে সিদ্ধি আমি কি করিয়া লাভ করিলাম!

সাধকের চক্ষে বিশ্বের সকলই ভাগবত-মূর্ত্তি—তাঁহারই প্রকাশ। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, যাঁহারা নিবিড় স্নেহ দ্বারা আমাকে বাঁধিতেছেন, তাঁহারা ভাগবত শক্তি, তাঁহারা কি নিত্যই চরণ ধরিয়া আমার সেবার জন্য, আমায় সাধিতেছেন না? এমন তপস্যা আমি কি করিয়াছি, তিনি সেবা দিয়া নিরন্তর আমাকে আকর্ষণ করিতেছেন! যিনি বহুর মধ্যে কেবল এককে চিনিয়াছেন, এবং শত হস্তের সেবার মধ্যে সেই কর-কমল দুইটির পরশ পাইয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন—

“পুরুষ পরশমণি নন্দের কুমার,
কি ধন লাগিয়া ধরে চরণে আমার!”

এই পদের পরের পদগুলি এইরূপ:—

“আমি যাই-যাই-যাই বলে’ তিন বোল।
কত না চুম্বন দেয়, কত দেহি কোল।
পদ আধ যায় পিয়া, চায় পালটিয়া,
বয়ান নিরখে কত কাতর হইয়া।” (চ)

কি অপার্থিব দৃশ্য! বিদায়কালে চিবুক ধরিয়া কৃষ্ণ "যাই" "যাই" বলিতেছেন; 'যাই' বলিলেই চলিয়া যাইতে পারেন না, রাধার মুখখানি তাঁহাকে ধরিয়া রাখে। পুনরায় 'যাই' বলিয়া বিদায় চান—প্রতিবারই ফিরিয়া আসিয়া সোগাগ করেন, আধ পা যাইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া চান এবং কাতর-দৃষ্টি মুখখানির প্রতি আবদ্ধ করিয়া থামিয়া দাঁড়ান, সে মুখ যে কোন কেন্দ্রীয় শক্তি দ্বারা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ ফিরাইয়া আনে! এই অসাধনের ধন পাইয়া কি ফেলিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়? কিন্তু যাইতে তো হইবেই; যদি সত্যই অঞ্চলের নিধি হারাইয়া যায়, যদি আবার না দেখিতে পান, তবে বাঁচিবেন কেমন করিয়া?

"করে কর ধরি পিয়া শপথি দেয় মোরে।
পুন দরশন লাগি কত চাটু বোলে।"

"রলয়োরভেদত্বাৎ"—'মোরে' ও 'বোলে'র গরমিল পাঠক ধরিবেন না। এগুলি গান, কাব্যের নিয়ম এখানে সর্ব্বদা চলে না।

তিনি হাত ধরিয়া শপথ চাহিতেছেন, "আমার হাত ছুঁইয়া বল, আবার দেখা পাব"—যে দর্শন সমস্ত সাধনার শেষ সিদ্ধি, সহস্র কষ্টের উপশম, ভবরোগের শ্রেষ্ঠ ভেষজ—সেই দর্শনের জন্য ভিক্ষা।

সেই সনাতন ভিখারী জীবকে এমনই করিয়া চান। হে মানব! তোমার দেবতা তোমাকে এমন করিয়া চান, মাতার উৎকণ্ঠার মধ্যে, স্বামীর সোহাগে, শিশুর ব্যাকুলতার মধ্যে সেই চিরন্তন ভিখারী এমনই করিয়া বারম্বার তোমার কাছে হাত পাতিয়া আছেন—তোমার চোখের মায়ার ঢাকনিটা খুলিয়া দেখিতে চাহিলে সেই প্রেম-ভিক্ষুকের এই চিত্রই দেখিতে পাইবে। কবে তোমাকে পাইব—এইজন্য তিনি কাকুবাদ করিয়া শপথ চাহিতেছেন।

৩। কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম

চণ্ডীদাসের একটি কবিতা, যাহা সচরাচর চণ্ডীদাসের পদাবলীতে মুখবন্ধস্বরূপ প্রথমে স্থান পাইয়া থাকে, এখানে সেইটির উল্লেখ করিব। কেহ কেহ এই পদটির মধ্যে শ্লীলতার অভাব দেখিয়াছেন। এমন লোকও আছেন, যাঁহাদের কাছে কালীঘাটের কর্দ্দমাক্ত গঙ্গাজলও পবিত্রতার খনি। আমি বৈষ্ণব-কবিতাগুলি যে ভাবে পড়িয়াছি, যে চক্ষে দেখিয়াছি, তদ্ভাবে ভাবিত লোক ছাড়া আমি সে চক্ষু অপরকে দিব কি করিয়া? যাঁহারা আমার ভাবে এই পদগুলি বুঝিবেন না, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার সাধ্য আমার নাই। তাঁহাদের নিকট আমার এই অনুরোধ, তাঁহারা যেন শেলী পড়েন, কীট্‌স্‌ পড়েন, বৈষ্ণব পদ পড়িয়া তাঁহাদের কোন লাভই হইবে না, অথচ হয় ত এমন কথা বলিয়া ফেলিবেন, যাহাতে অহেতুকভাবে অপরের প্রাণে ব্যথা লাগিতে পারে।

আমি “সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম” গানটির কথাই বলিতেছিলাম।

পার্থিব প্রেম ও ইন্দ্রিয়াতীত প্রেম—এই দুইয়ের মধ্যে একটা তফাৎ থাকিলেও, সাংসারিক প্রেমের মধ্য দিয়া এমন একটা সন্ধিস্থলে পৌঁছান যায়—যেখানে যেরূপ আকাশ ও পৃথিবী দিগ্বলয়ে পরস্পরকে ছুঁইয়া ফেলে, সেইরূপ পার্থিব ও অপার্থিব প্রেমের সেখানে দেখাদেখি হয়; গাছের ডালটারে আশ্রয় করিয়া যেরূপ স্বর্গের ফুল ফুটে, এই প্রেম সেই ভাবে জড়রাজ্য হইতে আনন্দলোক দেখাইয়া থাকে। কোন নায়ক-নায়িকা নাম জপ করিয়াছে, এমন তো বড় দেখা যায় না। তবে যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার নামটি যে মিষ্ট লাগে—তাহার উদাহরণ সাধারণ-সাহিত্যে একেবারে দুর্লভ নহে! বঙ্কিমচন্দ্রের কুন্দ নগেন্দ্রের নামটিতে সেইরূপ মিষ্টত্ব আবিষ্কার করিয়া সংগোপনে অতি সন্তর্পণে ‘নগ’ ‘ নগ’ ‘নগেন্দ্র’ এই অর্দ্ধস্ফুট শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়াছিল। অর্দ্ধোদ্গত কুসুম-কোরকের ন্যায় এই নাম লইতে যাইয়া তাহার ব্রীড়াশীল কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব পদ-মাধুর্য্যের এখানে একটু আভাষ পাওয়া যায় মাত্র।

কিন্তু ভাগবত-রাজ্যে নামই মুখ-বন্ধ। এ পথের নূতন পান্থ প্রথম প্রথম বিব্রত হইয়া পড়িবেন; নাম করিতে যাইয়া দেখিবেন, সাংসারিক চিন্তার নানা জটিল ব্যূহ তাঁহাকে ঘিরিয়ে ধরিয়াছে,—করাঙ্গুলীর সঙ্গে মালা ঘুরিতেছে, কিন্তু দুই এক মিনিট পরে পরেই অসতর্ক মন সংসারের নানা কথায় নিজকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে। তখন তিনি সাবধান হইয়া মনকে শুধু নামের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার সঙ্কল্প করিবেন। পুনরায় দেখিবেন, সাংসারিক চিন্তা, সন্তানের পীড়া,

মোকদ্দমার কথা, অর্থাগমনের উপায় প্রভৃতি বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মন চলিয়া যাইতেছে—এ যেন কাঁঠালের আঠা, ছাড়াইতে চাহিলেও ছাড়াইতে পারা যায় না।

কিন্তু দৃঢ়সংকল্প-দ্বারা অসাধ্যসাধন হয়। ধীরে ধীরে মনের আবর্জ্জনা দূর হইতে থাকে। পৌষের কুয়াশা কাটিয়া গেলে প্রাতঃসূর্য্যোদয়ের মত ক্রমে ক্রমে নামের মহিমা প্রকাশ পায়। এইভাবে মন স্থিত হইলে, ইন্দ্রিয়-বিকার থামিয়া গেলে, নাম আনন্দের স্বরূপ হইয়া অপার্থিব-রাজ্যের বার্ত্তা বহন করে। নামের এই অপরূপ আস্বাদ কতদিনে মানুষ পাইতে পারে জানি না, ইহা সাধনা ও যুগ-যুগের তপস্যা-সাপেক্ষ।

তখন নাম শোনা মাত্র উহা মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করে, কাণ জুড়াইয়া যায়—প্রাণ জুড়াইয়া যায়। প্রেমিক তখন পৃথিবী ভুলিয়া নামের পোতাশ্রয়ে নঙ্গড় বাঁধেন। সেস্থান শুধু নিরাপদ্ ও নির্ব্বিঘ্ন নহে—তাহার মোহিনীতে মন মুগ্ধ হইয়া যায়।

> “সই, কেবা শুনাইল শ্যাম-নাম।
> কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো—
> আকুল করিল মোর প্রাণ।”

কত তিলোত্তমা, কত রজনী, কত বিনোদিনী ও রাজ-লক্ষ্মীর প্রেমের কথা কবিরা আপনাদিগকে শুনাইয়াছেন, আপনারা সীতা-সাবিত্রী-দয়মন্তীর কথা শুনিয়াছেন;—কিন্তু এইরূপ না দেখিয়া নামের “বেড়াজালে” পড়িতে আর কাহাকেও দেখিয়াছেন কি? শুধু নাম শোনা নহে, নাম-জপ। “জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো”—নাম জপ করিতে করিতে ইন্দ্রিয়গুলির সাড়া থামিয়া যায়—যেরূপ হাটের কলরব দূর হইতে শোনা যায়, কিন্তু হাটের মধ্যে আসিলে আর সে কলরব শোনা যায় না। জপ করিতে করিতে বহিরিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া থামিয়া যায়—“অবশ করিল গো”-কথায় ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থার কথাই আমি বুঝিয়াছি।

বঙ্গীয় জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের এইখানে নাড়ীচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মনোভাব এখনও এইরূপ অর্থগ্রহণের অনুকূল আছে, বিদেশী শিক্ষার গুণে আমরা খনির কাছে থাকিয়াও মণির সন্ধান লইতে ভুলিয়া গিয়াছি।

নাম শুনিয়াই অঙ্গ এলাইয়া পড়িয়াছে, মন বেহুঁস্ হইয়া সেই নামরূপী ভগবানের দিকে ছুটিয়াছে। তিনি কে, যিনি শুধু নাম দিয়াই আমার মন হরণ করিয়াছেন? আমার বিদ্রোহী ইন্দ্রিয়গুলি আগুনের মত জ্বালা উৎপাদন

করিতেছিল, সেই অগ্নিকুণ্ডে শুধু নামের গুণেই যেন বারি বর্ষিত হইল–সকল জ্বালা, সকল তাপ জুড়াইয়া গেল।

এখন তাঁহাকে কি করিয়া পাইব? তিনি কে, কেমন করিয়া জানিব? ফুলের মালা হাতে করিয়া আছি, কাহাকে পরাইব?

"নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়!"

নাম-জপ শুষ্ক দৈহিক প্রক্রিয়া ছিল, কিন্তু এই বালুস্তূপ এক লুক্কায়িত ফল্গুনদীর অমৃত-উৎসের সন্ধান দিল। নাম শুনিলে মন চকিত হরিণীর ন্যায় ইতি-উতি কাহাকে খুঁজিতে থাকে? হারানিধি হইতেও তিনি প্রিয়তর, পৃথিবীর সমস্ত সুখ সে আনন্দের কণিকাও দিতে পারে না—

"না জানি কতেক মধু, শ্যাম-নামে আছে গো—
বদন ছাড়িতে নাহি পারে!"

যত বার তাঁর নাম আবৃত্তি করিতেছি, তত বার সাংসারিক ক্লান্তি ও অবসাআদ দূর হইয়া এক অলৌকিক পরমানন্দের আভাষ পাইতেছি, চক্ষু দুইটি অশ্রু-সিক্ত হইতেছে।

তাঁহাকে দেখি নাই, শুধু নাম শুনিয়াছি, তাহাতেই আমি আপন ভুলিয়াছি—তাঁহার স্পর্শ যেন কিরূপ? সে অমৃত-সায়রে কবে অবগাহন করিব? তিনি সর্ব্বত্র আছেন, শুনিয়াছি; কিন্তু ইহা তো একটা শোনা কথা। যেখানে "তাহার বসতি", আমি সেইখানেই আছি, তিনি এই মুহূর্ত্তে এইখানেই আছেন, এরূপভাবে তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিলে কি এই নয়ত-মিথ্যাচার-পূর্ণ সংসারে—এই ক্ষণবিধ্বংসী দেহ লইয়া—এই অসত্য ও ভ্রান্তির কুহক-জালে জীবন কাটাইয়া দিতে পারিতাম! যদি বুঝিতাম, তিনি এই মুহূর্ত্তে আমার কাছে আছেন, তবে কি তাঁহাকে ফেলিয়া—সত্যস্বরূপকে ফেলিয়া মরীচিকার পাছে ধাবিত হইতে পারিতাম! প্রিয়ের প্রিয় যিনি, আত্মীয়ের আত্মীয় যিনি, আপনা হইতে আপনার যিনি—যিনি মা হইয়া অক্লান্ত দাসীর ন্যায় আমার পরিচর্য্যা করিতেছেন, পুত্র হইয়া ভৃত্যের ন্যায় আদেশ পালন করিতেছেন, স্ত্রী হইয়া স্বীয় মুক্তকেশজালে আমার পায়ের ধূলা ঝাড়িতেছেন, সখা হইয়া আমার সঙ্গে খেলা করিতেছেন, শত্রু হইয়া আমার দোষ দেখাইতেছেন—আমারই মঙ্গলের জন্য—আমি বারম্বার ছুটিয়া পলাইতে চাই, তিনি তো তিলার্দ্ধকালও আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, কখনও চোখ রাঙ্গাইয়া শাসন করিয়া, কখনও পরিচর্য্যা করিয়া—আলিঙ্গন-চুম্বনে মুগ্ধ করিয়া যিনি সতত আমার কাছে আছেন, চোখের আড়াল হইতে দিতেছেন না—তিনি এই

মুহূর্ত্তে এইখানে আছেন, ইহা সত্য সত্যই উপলব্ধি করিলে কি আমি গার্হস্থ্যধর্ম্ম এখন যেমন করিয়া করিতেছি, তেমন করিয়া করিতে পারিব? তখন যে চক্ষু-কর্ণ প্রভৃতি দশ ইন্দ্রিয় মুগ্ধ হইয়া যাইবে—আনন্দহিল্লোলে মনসপদ্ম বিকশিত হইবে, শরীর কদম্বকোরকের ন্যায় ঘন ঘন রোমাঞ্চিত হইবে, তখন কি আমি কুলধর্ম্ম, গৃহধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম প্রভৃতি যাহা এখন পালন করিয়া থাকি, তাহা তেমনই ভাবে পালন করিতে পারিব?

কবি বলিতেছেন:—

“যেখানে বসতি তার   সেখানে থাকিয়া গো
যুবতীধরম কৈছে রয়?”

যে সকল কথা কাণে বাধে, তাহা অকুণ্ঠিতভাবে কবি বলিয়া গিয়াছেন, কারণ তাঁহার দৃষ্টি অন্তর্ম্মুখী,—

“কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস,   কুলবতী কুলনাশে
যুবতীর যৌবন যাচায়।”

এই শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ কৃষ্ণ প্রেম—ইহা যাহার মনে জন্মিয়াছে, পদ্মার ঢেউএ যেরূপ কুল ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহারও তো কুল সেইরূপ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কুল-গর্ব্ব, জাতি-গর্ব্ব, পদ-গর্ব্ব, এই সকল তো মত্ত হস্তীর ন্যায় আমার মনের দুয়ারে বাঁধা ছিল—

“দম্ভ-শালে মত্ত হাতী, বাঁধা ছিল দিবা রাতি”

আজ ইহাদের সকলেরই ছুটি; আমি অবরোধে ধৈর্য্য ও আত্ম-সংযম পণ করিয়া বসিয়াছিলাম, আজ সে “ধৈর্য্য-শালা হেমাগার” ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, আমি কিছুতেই নিজকে সামলাইতে পারিতেছি না। আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি এবং আমার সমস্ত তাঁহাকে নিবেদন করিয়া দিয়াছি। স্ত্রীলোককে তাহার লজ্জারূপ শাড়ী আবরণ করিয়া রাখে—প্রাণ যায় তবু লজ্জা ছাড়িতে পারে না, কিন্তু আজ আমি উপযাচক হইয়া আমার দেহ, মন, যৌবন ও লজ্জা তাঁহার চরণে ডালি দিয়াছি : “যুবতীর যৌবন যাচায়।” চণ্ডীদাস আর একস্থানে বলিয়াছেন, “কানুর পীরিতি—জাতিকুল-শীল ছাড়া।” সে রাজ্যে ব্রাহ্মণ-শূদ্র, কুলীন-অকুলীন নাই; “শীল”, আচার-বিচারের নিয়ম নাই।

আমি এই পদের অর্থ যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাই লিখিলাম। কিন্তু যিনি অন্যরূপ বুঝিবেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, শুধু নাম শুনিয়া বিহ্বল হয়, পাগলা-

গারদ ছাড়া এরূপ লোক কোথায়ও কি পাওয়া যায়? আর প্রেম করিয়া দিন-রাত্রি মধু-চক্রের ন্যায় নামকে আশ্রয় করিয়া আনন্দের সন্ধানে ফেরে, এরূপ কে আছে? কেবল এই পদে নহে, চণ্ডীদাসের বহু পদে শুধু পার্থিব ভাব দিয়া ব্যাখ্যা করিতে গেলে এইরূপ ঠকিতে হইবে।

৪। বাঁশীর সুর

বৈষ্ণব-কবিদের পূর্ব্ব-রাগের একটা বড় অধ্যায় কৃষ্ণের বাঁশীটিকে লইয়া। জগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাঁহার বাঁশী বাজিতেছে। কোন বৈষ্ণব কবি লিখিয়াছেন, বাঁশীর এক রন্ধ্রের সুরে বনে উপবনে কুসুমের কুঁড়ি ফুটিয়া উঠে, কোনও রন্ধ্রের সুরে বসন্তাগম হয়, কোন রন্ধ্রের সুরে ফুলফল মণ্ডিত হইয়া একত্র ষড় ঋতু দেখা দেয় এবং সকলের উপরে এক রন্ধ্রের সুর অবিরত জীবকে 'রাধা'-'রাধা' বলিয়া ডাকিতে থাকে। (পদকল্পতরু, জ্ঞানদাসের পদ)। আমাদের কাছে সে ডাক পৌঁছায় না, কারণ ইন্দ্রিয়ের কলরবে আমাদের কাণ বধির করিয়া রাখিয়াছে। সেক্ষপীয়র নীলাম্বরের নিস্তব্ধতার মধ্যে মানবাত্মার গভীরতম প্রদেশে শ্রুত সেই পরমগীতি আভাষে শুনিয়া লিখিয়াছিলেন, "Such harmony is in immortal souls; But whilst this muddy vesture of decay doth grossly close it in we cannot hear it."

বাঙ্গালা দেশে এক সময়ে এই বাঁশের বাঁশী মানুষের মনে সমস্ত সংগীতের সার সংগীত শুনাইয়াছিল। বাঙ্গলার রাখালেরা বিনা কড়িতে এই সুরের যন্ত্রটি পাইত, এখানে ঘাটে পথে বাঁশের ঝাড়, একটা মোটা কঞ্চি বা বাঁশের ডগা কাটিয়া বাঁশী তৈরী করিতে জানিত না, এরূপ রাখাল বাঙ্গলা দেশে ছিল না।

অবারিত সবুজ ক্ষেত্র, গোচারণের মাঠ, ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, ধলেশ্বরীর ন্যায় বিশালতোয়া নদ-নদী, উর্দ্ধে অনন্ত আকাশ—এই উদার ও মহান প্রাকৃতিক রাজ্যে বাঁশের বাঁশীর যে মর্ম্মান্তিক সুর উঠিত, তাহা শুনিয়া কুল-বধু আঁচলে চোখ মুছিত, সন্তান-হারা জননীর মর্ম্মে মর্ম্মে বিলাপের উচ্ছ্বাস বহিত, সাধকের মন দেবতার পায়ের নূপুর-ধ্বনি শুনিতে পাইত। সেই সুরের মর্ম্মান্তিক করুণা ও বিলাপ শুনিয়া মায়ের কোলে থাকিয়া শিশু রাত্রে ঘুমাইতে চাহিত না। এখনকার হারমোনিয়াম, ক্লারিওনেট্ এবং পিয়ানোর সুর খাঁটি বাঙ্গালীর কাণে তেমন লাগিবে না। পথে যাইতে যাইতে বাঁশীর সুর শুনিয়া পথিক থমকিয়া দাঁড়াইত—পথ ভুলিয়া যাইত, কলসীর জল ফেলিয়া কুলবধূ আবার জল আনিতে যাইত, সূর্য্য পশ্চিম গগনে ডুবিয়াও পুনরায় উঁকি মারিয়া মাঠের দিকে তাকাইতেন। বাঙ্গালার খাঁটি কবিরা বহুস্থানে এই বাঁশের বাঁশীর উল্লেখ করিয়াছেন। অর্ফিয়সের গানে পাহাড় টলিত, নদীর তুফান থামিয়া যাইত,—বাঙ্গলার বাঁশী ও সারেঙ্গের সম্বন্ধেও সেইরূপ অত্যুক্তি আছে। "নুরনেহার ও কবর" নামক পল্লী-গীতিকায় সারেঙ্গের সুরের যে উচ্ছ্বসিত বর্ণনা আছে, তাহা ঠিক বাঙ্গলা দেশেরই সুর-ভাণ্ডারের—এই অত্যুক্তির মধ্যে প্রাণে সাড়া দেওয়ার অনেক কথা আছে।

বাঁশের বাঁশীর সুর শুনিয়া ‘মহিষাল বঁধু’র নায়িকা রাখাল বালকের রূপ নূতন করিয়া দেখিতে শিখিয়াছিল:—

“আর দিন বাজে বাঁশী না লাগে এমন।
আজিকার বাঁশীতে কেন কাড়ি লয় মন।
লাজেতে হইল কন্যার রক্তজবা মুখ।
প্রথম যৌবন কন্যার এই প্রথম সুখ।”

‘আঁধা বঁধু’তে সেই সুরের মহিমা নন্দনকাননজাত ফুল-ফলের শ্রী লইয়া অপূর্ব্ব হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেঃ—

“বনের বাঁশী নয়ত ইহা মনের বাঁশী হয়।
ছোটকালের যত কথা জাগায়ে তোলয়।।

ভুলিতে না পারি বঁধু কেবলি অভাগা।
তোমার বাঁশী দিল বঁধু বুকে বড় দাগা।
কি করিব রাজ্য ধনে কুলে আর মানে।
সরম ভরম ছাড়লাম বঁধু তোমার বাঁশীর গানে।।
ভুলি নাই, ভুলি নাই বঁধু তোমার চাঁদ মুখ।
বনে গিয়া দেখাইব ছিঁড়িয়া সে বুক।”

বঙ্গদেশের কবিরা সুরের আনন্দদায়িনী শক্তির কথা গাহিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গলাদেশে বাঁশীর যে বর্ণনা আছে—উহা মর্ম্মের নিভৃত স্থান হইতে মর্ম্মোচ্ছ্বাসকে টানিয়া হিঁচড়াইয়া অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাসের তুফান বহাইয়া দিয়াছে,—অন্য দেশের কথা থাকুক, এই ভারতবর্ষেরও অন্য কোথায়ও সেরূপ দৃষ্টান্ত আছে কিনা জানি না। পাঠককে আমি অনুরোধ করিতেছি, তিনি এই খাঁটী বঙ্গীয় সুরের মহিমা বুঝিবার জন্য যেন “মহিষাল বঁধু”, “নুরনেহা ও করবরের কথা” এবং “আঁধা বঁধু” এই তিনটি পল্লী-গীতিকা পাঠ করেন।

চণ্ডীদাস এই বাঁশীর সুরে আধ্যাত্মিক আনন্দ যোগ দিয়াছেন। যে সুরে পূর্ব্ব হইতেই সুধারস সঞ্চিত ছিল, তিনি ভগীরথের ন্যায় বাঙ্গালা দেশে তাহার জন্য একটা গঙ্গার খাদ তৈরী করিলেন। এ পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্র, কংস, ভৈরব, সরস্বতী প্রভৃতি ছিল, গঙ্গার সঙ্গে ইহাদের কি প্রভেদ তাহা জানি না। তথাপি গঙ্গা গঙ্গা-ই,

তাহার স্থান স্বতন্ত্র। সেইরূপ 'মহিষাল বঁধু' ও আঁধা বঁধু'র বাঁশী ও সারেঙ্গ সকল বিষয়ে সমকক্ষতা করিয়াও চণ্ডীদাসের বাঁশীর সঙ্গে তাহাদের এক পংক্তিতে স্থান পাইবার দাবী কেহ কেহ মানিয়া লইবেন না—ইঁহাদের আইন-কানুন স্বতন্ত্র। আপনারা তাহাদের খেয়ালের সঙ্গে একমত না হইতে পারেন, কিন্তু সরল বিশ্বাসে হানা দেওয়ার অধিকার কাহারও নাই।

চণ্ডীদাস কাহিলেন—

"সবার বাঁশী কাণে বাজে,
বাঁশী বাজে আমার হিয়ার মাঝে।"

সে সুর বন্যার মত, দস্যুর মত ঘর-দোর ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করে। আমি রান্না-ঘরে রাঁধিবার আয়োজন লইয়া বসিয়াছি—

"বাশীর সুরেতে মোর এলাইল রন্ধন।" (চ)

তখন হলুদ দিতে যাইয়া ধ'নে দিয়া ফেলিলাম, সর্ষে দিতে যাইয়া নুন দিলাম, সব ভ্যাস্তা হইয়া গেল।

বাঁশী আর বেজ না——

"খল-সংহতি সরলা—তা কি জান না বাঁশী
আমি একে নারী, তায় অবলা" (চ)

আমি সরলা, খলের সঙ্গে আমার বাস, তোমার পাগল-করা সুরে আমার সকল কাজেই ভুল হয়,—চারিদিক্ হইতে নিন্দা ও বিদ্রুপের বাণ বর্ষিত হয়।

কে সে যিনি বাঁশী বাজাইতেছেন?

"কে না বাঁশী বায় সখি, সে বা কোন জনা।"

সুর আমায় পাগল করে, তিনি যিনিই হউন, আমার সাধ হয়, তার পায়ে নিজকে বিকাইয়া ফেলি।

কে সে তিনি "মনের হরষে" বাঁশী বাজাইতেছেন, আনন্দ-স্বরূপ স্বয়ং পরমানন্দে বাঁশী বাজাইতেছেন, কিন্তু তাঁর পায়ে আমি কি অপরাধ করিয়াছি, সেই সুরে যে আমার সংসার ভাসিয়া যায়! চোখের জলে পথ দেখিতে পাই না,—

"অধোরে ঝরায়ে মোর নয়নের পাণি,
বাঁশীর শবদে মুঞি হারাইলো পরাণী।" (চ)

বাঁশীর সুরে সংসার টুটিয়া পড়িতেছে। আনন্দময়ের আনন্দের আহ্বান, যে একবার শুনিয়াছে, সে ঘর করিবে কিরূপে?

"অন্তরে কুটিল বাঁশী, বাহিরে সরল।
পিবই অধর-সুধা উগারে গরল।" (চ)

বাঁশী কৃষ্ণ-মুখামৃত পান করিয়া বিষ-উদ্গীরণ করিতেছে—সংসার হইতে আমাকে টানিয়া বাহির করিতেছে। এই ব্রজপুরে তো আরও অনেক রমণী আছে, কিন্তু বাঁশী কেন শুধু 'রাধা' 'রাধা' বলিয়া আমাকেই ডাকে?

"ব্রজে কত নারী আছে, তারা কে না পড়িল বাঁধা।
নিরমল কুলখানি যতনে রেখেছি আমি,
বাঁশী কেন বলে "রাধা-রাধা"! (চ)

শুধু আমারই নাম ধরিয়া ডাকে, আমার কুল—রাজার মেয়ে আমি, আমার যে আকাশ-স্পর্শী উচ্চ কুল, আর তো তাহা থাকে না।

চারিদিকে আনন্দের ডাক পড়িয়াছে—সে ডাক নামের একটা "বেড়া-জালে"র সৃষ্টি করিয়াছে, মন-শফরী সেই জালে পড়িয়াছে। ডাহিনে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে শুনিতেছি 'রাধা', 'রাধা'। কে যেন আনন্দের বেড়া-জাল আমাকে দিয়া ঘিরিয়াছে, আমি পলাইতে পথে পাইতেছি না।

এই বাঁশীর সুরের কথা শত শত পল্লী-গীতিকায় আছে, বাঙ্গলা দেশের মেঠো হাওয়ায়—সুরের আকাশে তাহা প্রতিধ্বনির মত অবিরত ধ্বনিত হইতেছে। মাঝি

নৌকা বাহিরে বাহিরে দূর সিকতা-ভূমি হইতে তাহা শুনিয়া বৈঠা-হাতে মুগ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু চণ্ডীদাসের কবিতায় উহা উর্দ্ধলোকের সংবাদ। এই সংসারের সাজানো বাগান ভাঙ্গিয়া—শত রাগ-রাগিণীর অন্ধি-সন্ধি, তাল-মানের কার্‌তপ এড়াইয়া উহা সুরের ব্রহ্মলোকে পৌঁছিয়া দেয়—তাই কবি "বাঁশের বাঁশী"কে "নামের বেড়াজাল" বলিয়াছেন।

"সরল বাঁশের বাঁশী নামের বেড়াজাল।
সবাই শোনয়ে বাঁশী—রাধার হ'ল কাল। (৮)

রাধার সংসার-বদ্ধ ছেদন করিতে উহা অধ্যাত্মলোক হইতে আসিয়াছে।

নাম-জপ দ্বারা রাধা ইহলোক হইতে প্রেমলোকে আকৃষ্ট হইয়াছেন, এই জপের পরিবেষ্টনী অতিক্রম করিয়া অমৃতের অধিকারী হইয়াছেন, তার পরে বাঁশী—অশিষ্ট বাঁশী—ঘরের বউকে নাম ধরিয়া ডাকিয়াছে। অন্য এক কবি লিখিয়াছেন—আমার সুখের গৃহের উপর "বংশীরব বজ্রাঘাত, পড়ে' গেল অকস্মাৎ"; অপর কোন কবি বংশীরবকে বজ্রাঘাতের সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু শ্যামানন্দ তাঁহার চিরসুহৃৎ নরোত্তমের চিত্র স্মরণ করিতে করিতে রাধার সম্বন্ধে এই গানটি লিখিয়াছেন। রাজকুমার নরোত্তমের তরুণ বয়সে সে আহ্বান,—প্রাণেশ্বরের বংশীধ্বনি—বজ্রাঘাতের মতই পড়িয়া, তাঁহাকে রাজপ্রসাদ হইতে আনিয়া পথের ভিখারী করিয়া দিয়াছিল। রাধার কাছে এই আনন্দের আহ্বান বজ্রাঘাতের মতই নিদারুণ হইয়াছিল। তিনি ঘর-করণা করিতে সমস্ত আয়োজন গুছাইয়া লইয়াছিলেন, এমন সময়ে ডাক পড়িল, তখন সব ফেলিয়া না যাইয়া উপায় নাই, প্রাণ-বন্ধু ডাকিতেছেন।

৫। দর্শন

প্রথম দর্শন চিত্রে।

> “হাম সে সরলা, অবলা অখলা, ভালমন্দ নাহি জানি,
> বিরলে বসিয়া, পটেতে লিখিয়া, বিশাখা দেখালে আনি।” (চ)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, দর্শন-প্রার্থীকে প্রথমে আভাস মাত্রে দেখা দিয়া ভগবান প্রলুব্ধ করেন। এইজন্য চিত্র-দর্শনের পরিকল্পনা। সে রূপ নীল-কৃষ্ণ নব মেঘের ন্যায়, জগতের সমস্ত বর্ণের প্রধান বর্ণ। যাহা নীলাকাশে, নীলাম্বুতে, নীলবনান্তে সর্ব্বত্র খেলে, সেই নয়নাভিরাম স্নিগ্ধ কৃষ্ণাভ নীলরূপ—ভগবানের প্রতীক। রাধা যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেইদিকেই সেই স্মেরাস্য কমলনেত্র কৃপাময়ের কৃপার আলেখ্য। সেই রূপ সমুদ্রের মত বিশাল এবং জল-বিন্দুর মত ক্ষুদ্র, মহৎ হইতে মহান্, অণু হইতে অনীয়ান্। তিনি অনন্ত আকাশে অনন্ত শক্তির আধা, বহু-রূপ, বহু-শীর্ষ, বহু-প্রহরণধারী, কিন্তু আমার কাছে, আমারই মত ক্ষুদ্র; বড়র কাছে বড়, “ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং”, কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্রের কাছে তিনি ক্ষুদ্র। বিশাখা যখন চিত্রপট দেখায়, তখন আর আর সখীরা নিষেধ করিয়াছিল,

> “বিশাখা যখন দেখায় চিত্রপট।
> মোরা বলেছিলাম সে বড় লম্পট।।” (কৃ)

‘লম্পট’ কথায় পাঠক চমকিয়া উঠিবেন না; মহাজন-পদাবলীতে ভুবন-পাবন চৈতন্যদেবকে “কীর্ত্তন-লম্পট” বলা হইয়াছে। কৃষ্ণে সমর্পিতা প্রাণারাধা যখন—

> “কি চিত্র বিচিত্র মরি দেখিইল চিত্র করি,
> চিত মম নিলে যে হরি!”

বলিয়া সখীদের গলা জড়াইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন—তখন তাহারা বিলাপ করিয়া বলিতেছে,

"বিনা গুণ পরখিয়া কেন এমন হ'লি রাই;
দোষগুণ তার, না করি বিচার, কেবল রূপ দেখি রাই ভুলে গেলি।" (কৃ)"

চিত্র-দর্শনের পর ছায়া-দর্শন। যমুনা-তীরে নীপ-তরুর উপরে কৃষ্ণ। যমুনা-জলে শিখিপুচ্ছ ও মকর-কুণ্ডলের দীপ্তির প্রতিবিম্ব ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিয়াছে। রাধা উর্দ্ধে চাহিয়া কৃষ্ণরূপ দেখিতে পারেন নাই—কারণ "দাদা বলাই সঙ্গে ছিল" লজ্জায় মুখ উঁচু করিয়া কালো রূপ দেখিতে পারেন নাই। আনত চোখে যমুনা-জলে বিম্বিত কৃষ্ণকে দেখিতে ছিলেন, তিনি তখন জ্ঞান-হারা। সেই আনন্দময়, চির-সুহৃৎ, যিনি রূপের রূপ, সখার সখা, অন্তরে বাহ্যে জীব নিরন্তর যাঁহাকে খুঁজিতেছে, কখনও শিশুর হাস্যে, রূপসীর রূপে, মাতৃ-অঙ্কে, ফুলে-পল্লবে—পৃথিবীর সহস্র শোভায়—ধনে, মানে, প্রতিষ্ঠায় যাঁহার সন্ধান করিয়া সহস্রবার ভুল করিয়াছে—অমৃতকুণ্ড-ভ্রমে কূপে পড়িয়াছে—সেই রূপের সন্ধানে এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরিয়া ফিরিয়া ব্যর্থকাম হইয়াছে—আজ বহুদিন পরে, যুগ-যুগান্তের শেষে তাঁহাকে প্রথম দর্শন! এ কি অভাবনীয় আনন্দ! চৈতন্যদেব বলিয়াছেন—

"সর্ব্বত্র কৃষ্ণের রূপ করে ঝলমল।
সে দেখিতে পায় যার আঁখি নিরমল।।"

তিনি তো সর্ব্বত্রই আছেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখার নির্ম্মল চক্ষু আজ রাধা পাইয়াছেন। যমুনার জলে প্রতিবিম্বিত কৃষ্ণকে দেখিয়া তিনি যুগ-যুগান্তরের কষ্ট ভুলিয়া গেলেন। সখীরা জলে কলসী নামাইবেন, রাধিকা বলিতেছেন–

"ঢেউ দিও না জলে বলে কিশোরী।
দরশনে দাগা দিলে হবে পাতকী।।" (গো, ক)

কলসী জলে ডুবাইলে জলে আঁকা কৃষ্ণের ছায়া ঢেউ-এ ভাঙ্গিয়া যাইবে, এজন্য রাধা নিষেধ করিতেছেন; যিনি যোগীর যোগানন্দ, প্রেমিকের প্রেম-সিদ্ধি, যুগ-যুগ তপস্যার ফলে মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাকে পাইয়াছিলেন—এই আনন্দে বাঁধা দিলে পাপ হইবে, রাধা মৃদুস্বরে মিনতি করিয়া তাহাই বলিতেছিলেন।

তাহার পরের কথা চণ্ডীদাসের পদেই পাওয়া যাইবে।

## ৬।	আনন্দ

রাধা তাঁহার মনের অবস্থা কাহাকে বলিবেন? কেই বা তাহা বিশ্বাস করিবে? কেন অহেতুক দিন-রাত্র অঙ্গ শিহরিত হয়—আনন্দ হৃদয়ে উথলিয়া উঠে, চক্ষুকে সামাল দিব কিরূপে? আনন্দ-ঘন অশ্রু কি করিয়া রোধ করিব? যাহা ভাবি, তাহাতেই হর্ষোজ্জ্বল চক্ষে অশ্রু বহিয়া যায়। লজ্জায় গুরুজনের কাছে দাঁড়াইতে পারি না—

"গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি।
সদা ছল-ছল আঁখি।" (চ)

যেদিকে তাকাই, সেইদিকেই তাঁহার প্রকাশ—পুলকে চিত্ত ভরিয়া যায়:

"পুলকে আকুল, দিক্ নেহারিতে, সব শ্যামময় দেখি।" (চ)

কিন্তু একটা সময় আছে, যখন আমি আর আমাতে থাকিতে পারি না। সন্ধ্যায় যখন—

"রবি যায় নি পাটে,"

অস্তচূড়াবলম্বী সূর্য্য যখন পশ্চিম আকাশে স্বর্ণাক্ষরে কি লিখিয়া যান, কলসীকক্ষে সখীরা যমুনাতীরে যায়, তখন রাধার যে অবস্থা হয়, তাহা অবর্ণনীয়।

"সখীর সহিতে		জলেরে যাইতে
সে কথা কহিবার নয়।" (চ)

যমুনায় সখীদের সঙ্গে যাইবার পথে রাধার মন কেমন করে, তাহা বলিবার নহে। রাধিকা অত্যধিক মনের উচ্ছ্বাসে সে কথা বলিতে পারিতেছেন না, তাহা বলিতে যাইয়া ভাবাবেগে কণ্ঠরোধ হয়, কেবল মাত্র দুটি কথায় মনের সেই অব্যক্ত অনির্ব্বচনীয় কথা আভাসে বুঝাইতেছেন—

"সে কথা কহিবার নয়।"

চৈতন্যদেব গয়া হইতে ভাগবত পাদ-পদ্ম দর্শন করিয়া নদীয়ায় ফিরিয়া আসিয়া প্রিয় গদাধরের কাঁধে হেলাইয়া কি দেখিয়াছেন, বলিতে পারেন নাই, বলিতে যাইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন। রাধা এখানে যাহা বলিতেছেন, তাহা নিবিড় ও অস্পষ্ট,—

"সখীর সহিতে জলেরে যাইতে সে কথা কহিবার নয়।
যমুনার জল করে ঝল্‌মল তাহে কি পরাণ রয়।" (চ)

এইখানেই শেষ, যমুনার জল ঝল্‌মল্‌ করে, তাহাতে প্রাণে এত ব্যথা কেন? এ ব্যথা, আনন্দের ব্যথা—আনন্দের আতিশয্যে বাক্‌রোধ যমুনার জলে সূর্য্যাস্তের রক্তিম আভা পড়িয়া ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠে, রাধা কি তাহাই বলিতেছেন? সন্ধ্যানিলে স্বর্ণচূড় যমুনাতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, রাধিকা কি সেই কথা বলিতেছেন? যমুনার জলে সখীদের নীল শাড়ীর আভা মিশিয়া যে ঔজ্জ্বল্য খেলিতে থাকে, রাধা কি সেই কথা বলিতেছেন? রাধা তো কিছু খুলিয়া বলেন নাই; তবে কি সে ভাব, যাহাতে তাঁর প্রাণ এমন আকুল হয়?

তরুশাখে স্থিত ময়ুরপুচ্ছালঙ্কৃত কৃষ্ণের প্রতিবিম্ব পড়াতে যমুনার জল ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠে, তাহাই তিনি দেখিতে যাইতেছেন; যমুনার পথে সেই কথা মনে হওয়াতে রাধার আনন্দে বাক্‌রোধ হইতেছে। সেই অবর্ণনীয় সুখের কথা—যমুনার নীল জলে প্রতিবিম্বিত কৃষ্ণরূপের কথা—বলিতে যাইয়া ভাবের উদ্বেলের আতিশয্যে তিনি আর কিছু বলিতে পারেন নাই, শুধু বলিতেছেন,

"যমুনার জল, করে ঝল্‌মল্‌, তাহে কি পরাণ রয়?"

এইভাবে অর্দ্ধ-প্রকাশ—অর্দ্ধ-অপ্রকাশ কণ্ঠের ভাষায় চণ্ডীদাস তাঁহার রাধাকে চিত্রিত করিয়াছেন, এই স্তব্ধ চিত্র দেখিলে মনে হয় যেন কুবের তাঁহার ভাণ্ডার আগলাইয়া দাঁড়াইয়াছেন—তাহার বাহ্য প্রকাশ নাই। কৃষ্ণপ্রেমের এই "অনভিব্যক্ত রত্নোৎপত্তিরিবার্ণবঃ" ছবির তুলনা নাই। পরবর্ত্তী কবিরা এই কথার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন:—

"ঢেউ দিও না জলে বলে কিশোরী।
দরশনে দাগা দিলে হবে পাতকী।।"

চণ্ডীদাস কথা বলিতে বলিতে থমকিয়া যায়; বলিবার থাকে অনেক, কিন্তু বলেন অল্প। পাঠকের মনে ইঙ্গিতমাত্রে একটা তোলপাড় জাগাইয়া, তিনি অল্প কথায় শেষ করেন। তিনি কৃষ্ণ-রূপ মনে মনে ধ্যান করিয়া আবিষ্ট হইয়া পড়েন, তখন অন্য কোন ব্যাখ্যা না দিয়া আপন মনে নিজের শেষ সঙ্কল্পের কথা বলিয়া ফেলেন—

> "কুলের ধরম নারিনু রাখিতে, কহিনু তোমার আগে।
> চণ্ডীদাস কহে শ্যাম-সুনাগর সদাই হিয়ায় জাগে।।"

রাধিকা বলেন নাই, কিন্তু চণ্ডীদাস তাহা বলিয়া দিয়াছেন।

সমস্ত পদটি এই :-

> "কাহারে কহিব মনেরই মরম, কেবা যাবে পরতীত।
> (আমার) হিয়ার মাঝারে মরম-বেদন সদাই শিহরে চিত।।
> গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি, সদা ছল-ছল আঁখি।
> পুলকে আকুল, দিক্ নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি।।
> সখীর সহিতে জলেরে যাইতে সে কথা কহিবার নয়।
> যমুনার জল করে ঝল্‌মল্ তাহে কি পরাণ রয়।।
> (আমি) কুলের ধরম নারিনু রাখিতে কহিলাম তোমার আগে।
> কহে চণ্ডীদাস শ্যাম সুনাগর সদাই হিয়ায় জাগে।।"

এই গীতটি বাহ্য দৃশ্যে কতকটা অসম্পূর্ণ মনে হইবে, কিন্তু ইহা নিগূঢ় অর্থব্যঞ্জক।

রাধিকা বলিতেছেন, তাঁহার মনের অবস্থা কেহ বিশ্বাস করিবে না; কিন্তু কি বিশ্বাস করিবে না, তাহা বলেন নাই। গুরুজনের কাছে দাঁড়াইতে চোখে জল পড়ে বলিয়াছেন; কিন্তু কেন জল পড়ে, তাহা বলেন নাই। সখীর সঙ্গে জলে যাইবার সময়ে যে অবর্ণনীয় ভাব হয়, তাহা বলেন নাই। সখীর সঙ্গে জলে যাইবার সময়ে যে অবর্ণনীয় ভাব হয়, তাহা "সে কথা কহিবার নয়" বলিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন, এবং যমুনার জল ঝল্‌মল্ করিয়া উঠে, তাহাতে প্রাণ থাকে না কেন, তাহা তো মোটেই বলেন নাই; আভাষ যাহা দিয়াছেন, তাহাও অস্পষ্ট; কূলধর্ম্ম যে কেন রাখিতে পারেন না, তাহাও বলেন নাই। মোট কথা, এই কবিতাটিতে অনেক ফাঁক আছে, যাহা পাঠক নিজের মর্ম্ম দিয়া পূরণ করিবেন। যাঁহার সে মর্ম্মের আবেগ নাই,

তিনি বুঝিতে পারিবেন না। সেক্ষপীয়র লিখিয়াছেন, কবি ও পাগল এক সম্প্রদায়-ভুক্ত। পাগলের কথায় কথায় কতকগুলি শব্দ ও উচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু সমস্তটার কোন অর্থ হয় না ("Mere sound and fury, signifying nothing"); বড় কবির কথাও মাঝে মাঝে অসম্বন্ধ বলিয়া ঠেকিবে, কিন্তু ভাবুক তাহার ফাঁকে ফাঁকে গূঢ় অর্থ পাইবেন, কাঠুরিয়া যেরূপ কোন খনির কাছে আসিয়া হঠাৎ মাণিক কুড়াইয়া পায়।

আমি সর্ব্বদাই বলিয়া আসিয়াছি, বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের পদে কাব্য-লক্ষ্মী যেরূপ নিজ কৌটা খুলিয়া নানা জহরৎ ও মণিমুক্তা দেখান, চণ্ডীদাসসের কবিতায় কাব্য-লক্ষ্মীকে তেমন করিয়া পাওয়া যাইবে না। এখানে তিনি রহস্যময়ী, ভাবাবিষ্টা,—কাব্যলোকের ঊর্দ্ধে যে ধ্যানলোক, তিনি সেই ধ্যানলোকের দিকেই ইঙ্গিত করেন বেশী। তিনি স্বল্পভাষী; কিন্তু তাহার কথার মূল্য খুব বেশী, মহাজনের কষ্টি-পাথরে তাহা ধরা পড়ে।

কৃষ্ণরূপ-দর্শনের পর রাধা নিজের আনন্দে নিজে মগ্না। তিনি জগৎ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছেন, তিনি আনমনা, আবিষ্টা; তিনি একেলা বসিয়া থাকেন, সখীগণের সঙ্গও আর ভাল লাগে না। কেহ কিছু বলিলে শুনিয়াও তাহা শোনেন না, স্বীয় আনন্দে বিভোর, ধ্যানমূর্ত্তি। ধ্যানের সার-বস্তু কৃষ্ণরূপ তিনি দেখিয়াছেন, চক্ষু চারিদিকে সেই রূপের সন্ধান করে; আবেশে নীলাভ কৃষ্ণমেঘের দিকে চাহিয়া ধ্যানস্থ হইয়া যান—সেই কৃষ্ণবর্ণ-মাধুর্য্যে তাঁহার নিশ্চল চক্ষুর তারা যেন ডুবিয়া যায়। কখনও বা মেঘের কাছে তিনি কাতরোক্তি করিতেছেন; কি বলিতেছেন, কে বলিবে? কিন্তু যক্ষ যেরূপ মেঘকে দূত নিযুক্ত করিয়া প্রেমের বার্ত্তা পাঠাইয়াছিল—ইহা সেরূপ মেঘদূতের কথা নহে; এখানে রাধা কৃষ্ণের—কৃষ্ণ-রূপের—কৃষ্ণবর্ণের নমস্য প্রতীক-স্বরূপ নব মেঘের উদয় দেখিয়া হৃষ্টা হইয়াছেন, তখন যে কথা মুখে আসে, তাহা পৃথিবীর ভাষা নহে—সে ভাষা দেবলোকের ভাষা। কোন মল্লিনাথের সাধ্য নাই যে, সে ভাষার টীকা করে, স্বয়ং চৈতন্য তাঁহার জীবন দিয়া তাহার টীকা করিয়াছেন। রাধা

> "আকুল নয়নে চাহে মেঘপানে
> কি কহে দু'হাত তুলে।" (চ)।

মেঘের দিকে দু'হাত তুলিয়া তিনি কি যেন কি কথা বলেন!

এ 'কি জানি কি কথা' বুঝাইতে চাহিয়া কৃষ্ণকমল দুইটি মর্ম্মস্পর্শী গান রচনা করিয়াছেন, তাঁহার "রাই-উন্মাদিনী" নাটকে তাহা আছে। একটির আরম্ভ

এইরূপ:-(মেঘ-সম্বোধনে)

"ওহে তিলেক দাঁড়াও দাঁড়াও, হে এমন করে যাওয়া উচিত নয়।
যে যার শরণ লয়, নিঠুর বঁধু, তারে কি বধিতে হয়।"

অপরটি—

"কি ভাবিয়া মনে দাঁড়িয়া ওখানে, একবার নিকুঞ্জকাননে কর পদার্পণ।
একবার আসিয়া সমক্ষে দেখিলে স্বচক্ষে,
জান্‌বে,–কত দুঃখে রক্ষে করেছি জীবন।" (কৃ)

রাধিকার এই ধ্যানাগারের নিস্তব্ধতায় অপর সকলের প্রবেশ নিষেধ। এখানে চাঁপা ফুলের মালা খুলিয়া ফেলিয়া তিনি স্বীয় নিবিড় আলুলায়িত কুন্তলের বর্ণশোভা দেখিতেছেন, সেই শোভায় আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন—"না চলে নয়নের তারা।" নবোদিত কৃষ্ণমেঘের স্নিগ্ধ বর্ণে কাহার দেহ-প্রভা দেখিয়া মুহুর্মুহু চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইতেছে, এবং একদৃষ্টে ময়ূর-ময়ূরীর নীলমণি-খচিত কণ্ঠে কাহার বর্ণাভাসের সন্ধান করিতেছেন? এই অনধিগম্য ধ্যানের কক্ষে চণ্ডীদাস প্রবেশ করিয়া রাধার যে চিত্রটি আঁকিয়াছেন, তাহা এইরূপ:—

"রাধার কি হৈল অন্তর-ব্যথা,
সে যে বসিয়া একলে থাকয়ে বিরলে
না শুনে কাহার কথা।
এলাইয়া বেণী, ফুলের গাঁথুনি, খসায়ে দেখয়ে চুলে।
আকুল নয়নে, চাহে মেঘপানে, কি কহে দু'হাতে তুলে।।
বিরতি আহারে—রাঙ্গা বাস পরে, যেমন যোগিনী পারা।
সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে, না চলে নয়নের তারা।।
এক দিঠি করি, ময়ূরময়ূরী, কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।
চণ্ডীদাস কয় নব পরিচয়, কালিয়া বঁধুর সনে।"

ইহার পর:—

"সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি–ভূষণ খসিয়া পড়ে।" (চ)

কাহার বাঁশীর সুরের আভাষ শুনিয়া, কাহার নূপুর-সিঞ্জিত পদ-স্পর্শের পুলকে, জগতের প্রতি রেণুতে রেণুতে বিম্বিত কাহার কৃষ্ণবর্ণের মাধুরিমা লক্ষ্য করিয়া রাধিকা চমকিত হইয়া উঠিতেছেন! চঞ্চল শাড়ীর অঞ্চল শরীর-মুক্ত হইয়া মাটিতে লুটাইতেছে এবং ভূষণ খসিয়া পড়িতেছে, তিনি তাহা সংবরণ করিতে পারিতেছেন না। এই উন্মাদভাব লক্ষ্য করিয়া চণ্ডীদাস বলিতেছেন, রাধিকাকে "কোথা বা কোন্ দৈব পাইল?" গায়েন এই গান গাহিবার সময়ে ঊর্দ্ধে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া আখর দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে, "সে কোন্ দেবতা, রাধিকাকে যিনি এমন করিয়া পাইয়াছেন?" পরবর্ত্তী সময়ে সে দেবতা নদীয়ার সোণার মানুষটিকে এমনই করিয়া পাইয়াছিল, এজন্য তাঁহার জীবন-কথার দ্বারা চণ্ডীদাসের কবিতার টীকা হইয়াছে; নতুবা চণ্ডীদাসের কবিতার এই চিত্র, অন্ধের কাছে মহা-মাণিক্যের ন্যায়, সাধারণ নিকট মাটির ডেলার মত হইয়া পড়িয়া থাকিত।

চণ্ডীদাসের রাধা ও চৈতন্যের মূর্ত্তি পাশাপাশি রাখিয়া দেখিবেন, একই ছবির দুটি দিক্ মাত্র।

চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন:—

"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিল তিল আসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব-কাননে চায়।।
রাধার এমন কেন বা হৈল।
সদাই চঞ্চল বসন অঞ্চল,—সংবরণ নাহি করে।।
বসি' থাকি' থাকি', উঠয়ে চমকি', ভূষণ খসিয়া পড়ে।।"

রাধামোহন চৈতন্য-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—

"আজু হাম কি পেখনু নবদ্বীপ-চন্দ।
কর-তলে করই বয়ান অবলম্ব।
পুনঃ পুনঃ গত্যগতি করু ঘর-পন্থ।
ধেনে ধেনে ফুলবনে চলই একান্ত।
ছল-ছল নয়নে কমল সুবিলাস।
নব নব ভাব করত পরকাশ।"

এক জন "ফুল বনে চলই একান্ত" অপরে কদম্বকাননের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। একজন তিল তিল দণ্ডে দশবার ঘর-বাহির হইতেছেন, অপরে পুনঃ পুনঃ ঘর ও পথে যাতায়াত করিতেছেন। একজন নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছেন, উচ্ছৃঙ্খল শাড়ীর আঁচল সংবরণ করিতেছেন না, অপরে করতল দ্বারা বদন অবলম্বন করিয়া আছেন—ইহা একই চিত্রপট।

৭। অনুবাদ

রাধা ঘর-সংসার আগ্‌লাইয়া ছিলেন—সুখের সরঞ্জাম সকলই আছে; সংসারে দশজনের মত সংসারী সাজিবেন, গৃহস্থালী করিবেন—নববধূ রাধার মনে কত সাধ! কিন্তু সহসা কাহার নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন—যিনি তাঁহার আপন হইতেও আপন—এ যে তাঁহার স্বর! সংসার যাঁহাকে পর করিয়া রাখিয়াছে, তথাপি যিনি প্রাণের প্রাণ, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া রাধা যাঁহাকে চাহিয়াছিলেন, যাঁহাকে পাইবার জন্য কোন জন্মে কুটীরে কোন জন্মে রাজপ্রাসাদে, কোনবার সন্ন্যাসীর আশ্রমে, কোন বার মুছাফেরখানায়—কত বার কর রূপে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন–কখনও সেওড়া-গাছকে বিল্বতরু-ভ্রমে পূজা করিয়া নিষ্ফল হইয়াছেন, কখনও বা মালতীহার-ভ্রমে সর্পকে গলায় জড়াইয়া দংশনের জ্বালায় ছটফট করিয়াছেন—কখনও গঙ্গা-ভ্রমে কূপোদকে অবগাহন করিয়া বিষাক্ত জীবাণু দেহে লইয়া আসিয়াছেন, যখন যেখানে গিয়াছেন—"তত্রতত্রাচলাসক্তি"—সেইখানেই আসক্তির মোহে কাঞ্চন বলিয়া কাচকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন—আজ সেই চির-অভীপ্সিত জীবন-ধন কৃষ্ণের নাম শুনিয়াছেন—তখনই কাণ সেই নাম চিনিল, নাম কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মে প্রবেশ করিল, প্রাণ আপন জনকে চিনিতে পারিল। এইবার ঘোর দ্বন্দ্ব—সংসার সবে সোণার শিকল গড়াইয়া আনিয়াছে—পায়ে পরাইবে—ঘোর আসক্তি জন্মিয়াছে—এই সংসার কেমন করিয়া ছাড়িবেন? অপরদিকে যাঁহার নাম শুনিয়াছেন, তিনি যে জগতের সকল কিছু হইতে আপন। নাম যে দুর্দ্দান্ত দস্যুর মত সকল আসক্তি, সকল কামনা ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া আসিয়া পড়িয়াছে; হামাগুড়ি দিতে শিখিয়া দুরন্ত শিশু যেরূপ মায়ের সোণার গহনার বাক্সটি লইয়া টানাটানি করে, তাঁহার বড় সাধের আয়না, চিরুণী, ফিতা টান দিয়া ফেলিয়া দেয়—মা কিছুতেই তাহাকে রোধ করিতে পারেন না—রাধার আজ সেই অবস্থা! মা তাঁহার মূল্যবান্ অলঙ্কারগুলি জোর করিয়া—কাড়াকাড়ি করিয়া শিশুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে চান্, কিন্তু শিশু তাহা ছাড়ে না—নবোদ্গত দুটি দাঁত প্রকাশ করিয়া হাসে—সে হাসির মত অবাধ্য অথচ প্রিয়, অত্যাচারীর জোর এবং বিজয়ীর গর্ব্বের মত সে হাসির দুর্ল্লভ আনন্দ মাতার অপর সমস্তা চিন্তা ভুলাইয়া দেয়, আজ রাধার নাম শুনিয়া সেই অবস্থা হইতেছে। সে নাম শুনিবেন না—সংসারের সকল সুখের বিঘ্নকর কুলভঙ্গকারী নাম আর শুনিবেন না; পদ্মার মত উহা ঘর-বাড়ী ভাঙ্গিতে আসিতেছে; রাধা বিব্রত হইয়া আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছেন,—

> "পাশরিতে চাহি মনে, পাশরা না যায় গো,
> কি করিব, কহবি উপায়।" (চ)

কর্ণ যে একমাত্র কথা শুনিবার জন্য সহস্র কথা শুনিয়াছে, এবার তাহা শুনিয়াছে, অপর কথা শুনিবে কেন? প্রাণ যাঁহাকে খুঁজিয়া শত সহস্র বিষয়ের পিছনে পিছনে ছুটিয়াছে, আজ সে তাহা পাইয়া জুড়াইয়াছে,—মরীচিকার পিছনে সে ছুটিবে কেন? ইন্দ্রিয়গুলি সব বিদ্রোহী হইয়াছে—রাধা বলিতেছেন—

> "ধিক্ রহ আমার ইন্দ্রিয় আদি সব।
> সদা যে কালিয়া কানু হয় অনুভব।।" (চ)

একান্ত বিপন্না আজ রাধা, তাঁহার সর্ব্বস্ব গঙ্গার আবর্ত্তে ডুবিয়া যায়, এসময়ে নাবিক যেমন নিঃসহায়ভাবে ভগবানের শরণ লয়, রাধা তেমনি জোড় হস্তে, যিনি তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতেছেন—ছন্ন-ছাড়া, গৃহ-হারা করিতেছেন, তাঁহাকেই ডাকিয়া বলিতেছেন, "আমার রাজার কুল রাখ, আমার চিরপ্রতিষ্ঠ সতীত্বের গৌরব রাখ, সিংহদ্বারের মত অজেয় আমার ধৈর্য্য ও সংযম রক্ষা কর, আমার কুল-মান রাখ, এই আকাশ-স্পর্শী সামাজিক প্রতিষ্ঠার অট্টালিকা রাখ,—আমার বড় সাধের গৃহস্থালী রাখ।" নাম-দস্যু তাহা শুনিল না,—সমস্ত দর্প, অভিমান, রমণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভূষণ, লোকলজ্জা ও ধৈর্য্য ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চুলের মুটি ধরিয়া রাধাকে বাহিল করিল। তখন কোথায় গেল কপিলাবস্তুর রাজপ্রাসাদ, কোথায় গেল উত্তর-কোশলের রাজধানী অযোধ্যা, কোথায় গেল নদীয়ার শচী-মায়ের স্নেহ-নীড় ও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমকুঞ্জ, শ্রীখেতুবীর রাজপুরী—মুণ্ডিত মস্তক, করঙ্ক-হস্ত, যজ্ঞ-সূত্রহীন, শিখাশূন্য, সংসারের সর্ব্ব-সংস্কার-মুক্ত এক অপাপ-বিদ্ধ, অনবদ্য মূর্ত্তি বাহির হইল, ঘরের বাহির হইবার পূর্ব্বে রাধা একবার সখীদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন,

> "আছে শুধু প্রাণ বাকি—
> তাও বুঝি যায় সখি,
> কি করব কহবি উপায়?" (শ্যা)

'আমার সাংসারিক জীবনের অবসান হইয়াছে, প্রাণ আছে, কিন্তু তাহা সাংসারিক সুখ-দুঃখে আর সাড়া দেয় না।' সখীরা বলিতেছেন—শ্যাম একবার যাঁহাকে ধরেন, তাঁহাকে ছাড়েন না, তুমি তাঁর পায় ধরিয়া বল "আমায় নিও না"

"শ্যামানন্দ দাসে কয়　　　　শ্যাম তো ছাড়িবার নয়
পার যদি ধর গিয়া পায়।"

রাধা তখন কৃষ্ণের পায়ে ধরিলেন,—সেই চরণ-কমলই পাইলেন, আর কিছু পাইলেন না। তখন "সকলই পাইয়াছি", বলিয়া সেই চরণ-কমল শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন।

সে পথে যাইব না বলিয়া পা' ফিরাইয়াছি, তবুও পা' সে পথে গিয়াছে; জিহ্বাকে সংযত করিয়া বলিয়াছি, কৃষ্ণনাম লইও না, জিহ্বা সে নাম ছাড়ে নাই; যাঁহার নাম শুনিব না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি, কিন্তু প্রসঙ্গে কেহ তাঁহার কথা উত্থাপন করিলে কাণ অতর্কিত ভাবে সেই নাম অভিনিবিষ্ট হইয়া শুনিয়াছে। সংসার হিরণ্যকশিপুর মত যত উৎকট বাধার সৃষ্টি করিয়াছে, রাধিকার প্রাণ প্রহ্লাদের মত প্রবল বেগে সে বাধাগুলি অতিক্রম করিয়াছে,—

"যত নিবারিয়ে তায় নিবার না যায়,
আন পথে ধায় পদ কানু-পথে ধায়।
এ ছার বাসনা মোর হইল কি বাম,
যার নাম নাহি লব লয় সেই নাম।।
যে কথা না শুনিব করি অনুমান।
পর-সঙ্গে শুনিতে আপনি যায় কাণ।।
এ ছাড় নাসিকা মুঞি কত করু বন্ধ।
তবু তো দারুণ নাসা পায় শ্যাম-গন্ধ।।
ধিক্ রহ এ ছাড় ইন্দ্রিয় আদি সব।
সদা সে কালিয়া কানু হয় অনুভব।।" (চ)

দশ ইন্দ্রিয় করযোড়ে তাঁহার পূজা করিতে দাঁড়াইয়াছে। নব মত্ত করী "যেমন অঙ্কুশ না মানে" রাধিকার মন কিছুতেই সেই ইন্দ্রিয়ের গতি ফিরাইতে পারিতেছে না।

অন্যান্য কবিদের রাধাকৃষ্ণ মানস-হ্রদের রাজ-হংস, তাঁহাদের লীলাই বেশী করিয়া চক্ষে পড়ে। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার নিকট কৃষ্ণ-প্রেম আসিয়াছে বন্যার মত। অপরাপর কবিরা কেহ এই প্রেমকে ঠেকাইয়া রাখিতে চান নাই, কারণ তাহার বেগ এত প্রলয়ঙ্কর নহে। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধা 'রাগানুগা' প্রীতির সর্ব্বোচ্চ দৃষ্টান্ত—সে দৃষ্টান্তে আমরা শুধু চৈতন্য-দেবে পাই। যখন উহা আসে, তখন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আসে, সমস্ত বাধা চূর্ণ করিয়া গঙ্গার মত সগৌরবে বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিতে করিতে আসে।

এখানে একটা অবান্তর কথা বলিব। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে একেবারে নির্ম্মূল করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বৈষ্ণবেরা বলেন, জগতের কিছুই মিথ্যা বা অব্যবহার্য্য নহে। এই ইন্দ্রিয়গুলির যে দুর্দ্দমনীয় শক্তি, তাহা ভগবানের মন্দিরে পৌঁছাইবার প্রকৃষ্ট পন্থা, এ জগতের খড়-কুটো সকলটা দিয়াই বিশ্বের প্রয়োজন আছে। রাধিকা ইন্দ্রিয়ের দুর্দ্দমনীয় স্রোতঃ দিয়া সেই পথে যাইতেছেন, যে পথে দিয়া গেলে ডিঙ্গি "অন্তিমে লাগিবে গিয়া ত্রিদিবের ঘাটে।"

আমি বৈষ্ণব-কবিতা প্রসঙ্গে একস্থানে লিখিয়াছিলাম—এই পদাবলী যেন সমুদ্র-মুখী নদীর স্রোত:—দুই কুলে মনুষ্য-বসতি, ভ্রমরগুঞ্জিত পুষ্পবন, হাটের কলরব, পথিকের রহস্যালাপ, গোচারণের মাঠ, শিশুর কাকলী-মুখরিত মাতৃ-অঙ্গন, সখাদের খেলাধূলা,—নদীর যাত্রাপথের দুই দিকে কত দৃশ্য—কত মন্দানিলচালিত, কেতকীকুন্দ-গন্ধামোদিত উপবন, কত সোণার ফলসে হাস্যময় দিগ্বলয়ে দিগ্বধুদের অঞ্চললীলা। পার্থিব সকল দৃশ্যই দু'কূলে দেখিতে দেখিতে নৌকার পান্থ চলিতে থাকিবেন। কিন্তু যখন মোহনায় পৌঁছিবেন, তখন দেখিবেন, দূরে অকুল-প্রসারিত অনন্ত সাগর, সেখানে সমস্ত কলকোলাহল থামিয়া গিয়াছে, সেখানে জগতের সমস্ত রহস্যের নির্ব্বাক্ ধ্যানমূর্ত্তি। বৈষ্ণবকবিরা জগতের কোন কথাই বাদ দেন নাই, কিন্তু সকল কথার সঙ্গেই পরমার্থ-কথার যোগ রাখিয়াছেন; এই সাহিত্য-ধারার সর্ব্বত্রই সমুদ্রের হাওয়া খেলে, এখানে মোহনা বন্ধ হইয়া নদী বিলে পরিনত হয় নাই; অনন্তের সঙ্গে এই যোগ—ইহাতে বৈষ্ণব সাহিত্যের সর্ব্বত্র এক পাবনী-শক্তি বিদ্যমান। এই বৈশিষ্ট্য সাধারণতঃ পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না, বৈষ্ণবপদ রস ও রহস্যের সংমিশ্রণে অপূর্ব্ব হইয়াছে। আমরা যতই কেন ক্ষুদ্র না হই, অনন্তের সঙ্গে যোগ থাকাতে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনন্ত; মানুষ কোথায় যাইতেছে, এত হাঁটাহাটি—এত ক্লান্তি, এত অবসাদ, এত সুখ-দুঃখের পরিমাণ কি, তাহা আমরা বলিতে পারিতেছি না। কিন্তু আমাদের এই দুর্গম পথে যে ভবিষ্যতের বহু দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত এবং আমরা যে এই পথের ক্ষুদ্রতম একাংশ মাত্র পর্য্যটন করিতেছি, তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতেছি। বৈষ্ণব কবিতার প্রতি পৃষ্ঠায় এমন দুই একটি ছত্র পাওয়া যাইবে, যাহাতে সেই অনন্ত পথের আভাস আছে, এই জন্য এই কবিতাগুলি রসিক পাঠকের যেমন উপভোগ্য, তাহা হইতে যাঁহারা বেশী কিছু চাহেন, সেই রূপ পাঠকেরও তেমনি বা ততোধিক উপভোগ্য। এই রস-ধারা মর্ত্ত্যের পথেই চলিয়াছে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে—ইহা বিষ্ণুপদচ্যুতা। জয়দেব লিখিয়াছেন,—

যদি হরি স্মরণে সরসং মনো-
যদি বিলাসকলাসু কুতুহলং।

মধুরকোমলকান্তপদাবলীঃ
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্।।

যাঁহারা ভগবৎপ্রসঙ্গ শুনিতে চাহিবেন এবং যাঁহারা পার্থব প্রেমের আস্বাদ প্রত্যাশা করেন, সেই উভয়বিধ পাঠকের তৃপ্তির উপকরণ গীতগোবিন্দে আছে।

চণ্ডীদাস যখন নাম-জপের কথা বলিতেছেন, রাধাকে নীলাম্বরী শাড়ী ছাড়াইয়া গৈরিক বাস পরাইতেছেন, তাঁহাকে দিয়া উপবাস করাইতেছেন ("বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে"), তখন আমরা সত্যই সেই পারমার্থিক ইঙ্গিত বুঝিয়াছি। এই উপলক্ষে কবি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন "যেমন যোগিনী পারা।" রাধার ভাব-বিহ্বলতা বাড়িয়া যাইতেছে, তিনি জপ ছাড়িতে পারিতেছেন না, নাম—"বদন ছাড়িতে নাহি পারে"। কোন কোন স্থানে রাধিকা মন্দিরের পুরোহিতের ন্যায় মন্ত্রপাঠ করিতেছেন,—

"অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া,
যোগীর আরাধ্য ধন,
গোপ-গোয়ালিনী, হাম অতি দীনা
না জানি ভজন পূজন।"
"বঁধু কি আর বলিব আমি আমার জীবনে মরণে
জনমে জনমে প্রাণ-বঁধূ হইও তুমি,
তোমার চরণে, আমার পরাণে
বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি
সব সমাপিয়া, এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী" (চ)

এই গানটি কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের ধর্ম্মসঙ্গীতগুলির মধ্যে স্থান দিয়াছেন। ['বঁধুর' স্থানে 'প্রভো', "জনমে-জনমে"র স্থলে "জীবনে জীবনে", "ফাঁসি"র স্থলে "ফাঁস", সুতরাং দাসীর স্থলে 'দাস'] এই গানটি সম্বন্ধে পরে আরও কিছু লিখিব। এরূপ অনেক পদ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, চণ্ডীদাসের মূল সুর কোথায়? তিনি জগতের ভিতর দিয়া জগদীশ্বরকে দেখিয়াছিলেন,—তিনি কোন মন্দিরে তাঁহার সাক্ষাৎলাভ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছয়ে যে জন,
কেহ না জানয়ে তারে,

প্রেমের আরতি যে জন জানয়ে,
সেই সে চিনিতে পারে।” (চ)

এই প্রেম-তীর্থের পথিকরে আমাদের এত ভাল লাগে এইজন্য যে, বিষ্ণুশর্ম্মা যেরূপ গল্প শুনাইতে যাইয়া রাজকুমারদিগকে নীতি-শিক্ষা দিয়াছিলেন, চণ্ডীদাসও তেমনই মানুষী প্রেমের কাহিনী দ্বারা লুব্ধ করিয়া তাঁহার দেশবাসীকে সর্ব্ব কথার মধ্যে যাহা সার কথা তাহাই শিখাইয়াছিলেন। ভাল গায়েনের মুখে কীর্ত্তন না শুনিলে বৈষ্ণব কবিগণের পদের অর্থ সম্যক্ বুঝা যাইবে না। যেরূপ গাছ-গাছড়ার উপাদানের সঙ্গে না মিশাইলে ভেষজ সার্থক হয় না, সেইরূপ কীর্ত্তনের আসরে না গেলে মহাজনগণের স্বরূপ আবিষ্কার করা অনেকের পক্ষে দুষ্কর হইবে।

৮। গৌরদাস কীর্ত্তনীয়া

আমি অনেক ভাল ভাল কীর্ত্তনীয়ার কীর্ত্তন শুনিয়াছি। বর্দ্ধমানের রসিক দাস, কুষ্টিয়ার শিবু, বীরভূমের গণেশ দাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গায়েনদের কীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু নদীয়ার গৌরদাসকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, সেরূপ আর কোন কীর্ত্তনীয়াকে দেখি নাই। এক সময়ে আমি ইংরেজী ও সংস্কৃত নানা কাব্য পাঠে আনন্দ পাইতাম, কিন্তু পান্থ যেরূপ নানা স্থান ঘুরিয়া শেষে বাড়ীর ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া সোয়াস্তি পায়, আমি জীবন-সায়াহ্নে সেইরূপ কীর্ত্তনের আনন্দে অন্য সমস্ত সুখ ভুলিয়া গিয়াছি। গৌর দাস কীর্ত্তনীয়ার মধ্যে যে ভক্তি, প্রেম ও কাব্যের বিকাশ দেখিয়াছি, তাহাতে আমার মন একবারে কীর্ত্তনে মজিয়া গিয়াছিল। গৌরদাসের বর্ণ ছিল কালো, দেহ ছিপছিপে, মুখ-চোখে প্রতিভার কোনই ছাপ ছিল না। পথ দিয়া চলিয়া গেলে তাঁহাকে অতি সাধারণ লোক বলিয়া মনে হইত। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার বয়স হইয়াছিল ৪৮।৪৯। এই লোকটি গানের আসরে নামিলে তাহার রূপ বদলাইয়া যাইত, সে নিজে না কাঁদিয়া শত শত লোককে অশ্রুজলে ভাসাইয়া লইয়া যাইত। সে ছিল সংগীতচার্য্য। তাল মান এ সকল ছিল তাহার আজ্ঞাকারী ভৃত্য, কিন্তু প্রেমের অলৌকিক প্লাবনে মনে হইত, তাহার সঙ্গীত-বিদ্যার কোন নিয়মের দিকে সে দৃক্‌পাত করে না, অথচ সে যেদিকে একটু হাতের ইঙ্গিত করিয়াছে, কি পা বাড়াইয়াছে, সেইদিকেই তাল-মান রাজার হুকুমে নফরের ন্যায় ছুটিয়া গিয়াছে। আখরগুলি তাহার হৃদয়োচ্ছ্বাস হইতে শত শত স্বর্ণপদ্মের ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং তাহার সাবলীল কণ্ঠের বিলাপময় আলাপের পাছে রাগ-রাগিণী পতি-বিরহিতা স্ত্রীর ন্যায় পাগল হইয়া ছুটিতেছে। আমি এরূপ কীর্ত্তন আর শুনি নাই, তাহার ৪।৫ ঘন্টার কীর্ত্তন এক নিমেষের মত কোথা দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতাম না। গৌরদাস সত্য সত্যই এই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিবার শক্তি রাখিত। গোষ্ঠ গাহিতে গাহিতে সে প্রারম্ভে কৃষ্ণসখাদের যশোদার আঙ্গিনায় আনিয়া উপস্থিত করিত, সে যখন "গগনে হইল বেলা যত শিশু হয়ে মেলা রে—উপনীত নন্দের ভবনে" "কিবা বেণু-বীণা-বাঁশী রব, করয়ে রাখাল সব" গাহিত, তখন যেন আকাশ-পটে চিত্রিত সুরঞ্জিত প্রভাত দৃশ্যকে সকলের প্রত্যক্ষে উপনীত করিত। ইহার পরে "আওত সুদামচন্দ রঙ্গিয়া পাগড়ী মাখে" গাহিয়া সর্ব্বপ্রথম সুদামকে উপস্থিত করাইত। সে রূপ-বর্ণনা অপূর্ব্ব! সুদামের মাথার পগ্‌গ কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে বারে বারে খসিয়া পড়িতেছে,—"পগ লটপটি শিরে", তাহার গলায় মতির হারের সঙ্গে "গো-বাঁধন দড়ি" ঝুলিতেছে—"স্ফূট চম্পকদল নিন্দিত" তাহার বর্ণ। তৎপর অপরাপর সখার বর্ণনা, তাহাদের প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ভিন্ন ভিন্ন বেশভূষা—"যার মা যেমন সাজায়েছে", কিন্তু তাহারা সকলে এক ডুরিতে বাঁধা, তাহা কৃষ্ণপ্রেমের ডুরি। চিত্রের পুত্তলীয় ন্যায় তাহারা একে একে নন্দের ভবনে উপস্থিত হইয়া দাদা বলাই-এর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সুবলের সঙ্গে কৃষ্ণের অনেক

তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। সুবল বলিতেছে, "এই বৃন্দাবনে তো সকলেরই মা আছেন, তোমার মা ইহাদের উপরে গেলেন কি করিয়া? আমরা তো মায়ের নিষেধ না মানিয়াই আসিয়াছি। তোমাকে ছাড়া আমরা থাকিতে পারি না—

যখন মায়ের কাছে ঘুমিয়ে থাকি,
তখন স্বপনে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ডাকি।

সত্যই ইহারা কৃষ্ণ-প্রেমে তন্ময়। কৃষ্ণ বলিলেন, "দেখ 'আমি চুড়া বেঁধে ধড়া পরে বসে রয়েছি—সে তোমাদেরই জন্য—মায়ের আদেশের প্রতীক্ষায়। আমার মা যে আমাকে ছাড়া তিলার্দ্ধও থাকিতে পারেন না—ইহার উপায় কি? যদি আমি না বলিয়া চলিয়া গেলে মা মারা যান, তবে ভাই কি করিব? সত্যি সত্যি বলছি—

একদিন নবনী খেয়েছিলেম লুকাইয়ে।
মরিতেছিলেন মা আমার না দেখিয়ে। (শে)

সুবল ছাড়িবার পাত্র নহে। সখাদের বিশ্বাস তাহারা কৃষ্ণকে যেরূপ ভালবাসে, মা যশোদাও তাহাকে সেরূপ ভালবাসিতে পারেন না। সে বলিতেছে—

"জানি রে তোর মায়ের প্রেম যত ভালবাসে,
সামান্য ননীর লাগি বেঁধেছিল গাছে।"

তোর দু'খানি কোমল কর স্পর্শ করিতে আমরা আশঙ্কায় মরি, পাছে আমাদের কঠোর স্পর্শে তাহা ব্যথিত হয়, কোন্ প্রাণে মা যশোদা সেই কোমল হাত দু'খানি দড়ি দিয়া বেঁধেছিলেন? সেই দড়ির দাগ এখনও তোর হাতে আছে, একটুখানি ননীর জন্য এত বড় শাস্তি দিলেন, সেই বাঁধার দাগ আমাদের বুকে শেলের মত বিধিয়া আছে! আর এক দিনের কথা—

যমল অর্জ্জুন যে দিন পড়েছিল গায়,
সে দিন তোর মা নন্দরাণী আছিল কোথায়?

তিনি এত বড় দুটো অর্জ্জুন গাছের সঙ্গে তো দড়ি দিয়া শিশুটিকে বাঁধিয়া গেলেন, কিন্তু যখন সে দুটো গাছ তোর ঘাড়ে পড়িল, তখন নন্দরাণী কোথায় ছিলেন—আমরাই তো তোকে আসিয়া বাঁচাইয়াছিলাম।”

এই তর্ক-বিতর্কে মা যশোদার আঙ্গিনা মুখরিত হইয়া উঠিল। সখারা কাঁদিয়া বিভোর হইতেছে, রাণীকে বলিতেছে—“আমরা তোমার গোপালকে চারিদিকে ঘিরিয়া থাকি, ‘সকল রাখাল মিলি, মাঝে থাকে বনমালী’, কানুর পায়ে একটি কুশাঙ্কুর ফুটিলে আমাদের প্রাণে বিঁধে।” তাহারা যশোদাকে অনেক অনুনয় বিনয় করিল—কৃষ্ণের দিকে চাহিয়া সজল চক্ষে বলিল, আমাদের মত “বিনি কড়িতে হেন নফর কোথা পাবি?” সে সকল উচ্ছ্বসিত আবেদন নিবেদনে যশোদার মন কতকটা গলিয়া গেল। তিনি কৃষ্ণকে সাজাইতে বসিলেন—বিবিধ অলঙ্কারে কৃষ্ণের অঙ্গ ঝল্‌মল্‌ করিতে লাগিল, কৌটা খুলিয়া অলকা-তিলকা পরাইলেন, চন্দনের ফোঁটায় যেন “কপালে চাঁদের উদয়” হইল। সমস্ত দেবতাকে ডাকিয়া রাণী কানুকে কাননে রক্ষা করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এইবার সখাদের সঙ্গে কৃষ্ণ গোষ্ঠে বাহির হইবেন। রাণী কানুর পায়ে নূপুর পরাইতে পরাইতে ভাবাবেশে সাশ্রুনেত্র হইলেন; কিন্তু পায়ে আল্‌তা পরাইবার সময়ে আর নিজকে সামলাইতে পারিলেন না, তখন কাঁদিয়া বিবসা পাগলিনীর ন্যায় রাণী আঙ্গিনায় বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন—“আমি কিছুতেই আজ গোপালকে গোষ্ঠে যাইতে দিব না। তোরা যদি জোর করবি, তবে মাতৃবধের দায়িক হবি।”

সখারা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

এই সময়ে তাহাদিগের মনে নূতন আশায় সঞ্চার করিয়া আকাশে বলরামের শিঙা বাজিয়া উঠিল। দাদা বলাই আসিতেছেন, সুতরাং যশোদা তাঁহার সঙ্গে ঘাঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না। বারুণী-পানে মত্ত বলাই আসিতেছেন, কবি বলিতেছেন, বলাই-এর বারুণী বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম, তিনি একটু তোত্‌লা, (নিত্যানন্দ একটু তোত্‌লা ছিলেন, কবিরা বলরামে তাহাই আরোপ করিয়াছেন), টলিতে টলিতে বলাই আসিতেছেন, শিঙায় কানাই-এর নাম একটু ঠেকিয়া ঠেকিয়া আসিতেছে, ‘কা-ক্কা কানাই’ বলিতে বলিতে আসিতেছেন, তাঁহার মুখপদ্ম কৃষ্ণ-প্রেমাশ্রুতে ভাসিয়া যাইতেছে। মা রোহিণী যেখানে যেটি সাজে, তাই দিয়া বলাইকে সাজাইয়া দিয়াছেন।

“গলে বনমালা হাতে তাড়-বালা, শ্রবণে কুণ্ডল সাজে।
ধব-ধব-ধব ধবলী বলিয়া ঘন ঘন শিঙা বাজে।

(কিবা) নব নটবর নীলাম্বর লম্ফে ঝম্পে আওয়ে।
মদে মাতল কুঞ্জর গতি উলটি পালটি চাওয়ে।"

এই সুদর্শন শুভ্রকান্তি বিরাট্ দেহ বলদেবের পদভরে ধরিত্রী কম্পিত হইতেছে। মাতাল বলাই বলিতেছেন, "থির রহ ধরণী"—পৃথিবীকে এই ভাবে আশ্বাস দিয়া আসিতে আসিতে বৃন্দাবনের প্রাতঃ-সূর্য্যকরে প্রতিবিম্বিত স্বদেহের বিরাট্ ছায়া দেখিয়া তিনি মনে করিলেন, সত্যই বৃন্দাবন দখল করিতে কোন প্রবল আগন্তুক অভিযান করিয়া আসিয়াছে, তখন মত্ত বলাই ছায়াকে জিজ্ঞাসা করিতেছে "তুই কে, পরিচয় দে? আমি কা-ক্কা কানাই এর দাদা, জানিস্ আমি কত বড়!" বলাই বলিল না, যে তাঁহার হলকর্ষনে জগৎ উল্‌টিয়া যাইতে পারে, সে বড় বড় অসুরকে অবলীলাক্রমে বধ করিয়াছে। বৃন্দাবনে সমস্ত রাজসিক দর্প ভাসিয়া গিয়াছে, কৃষ্ণপ্রেম ছাড়া সেখানে গৌরব করিবার কিছু নাই। তাই সে পরম দর্পে নিজ ছায়াকে বলিতেছে, "জানিস্ আমি ভাই কানাই-এর দাদা, এই পুরুষ বাক্যের উচ্চারণকালে তাঁহার ভ্রমরপুঞ্জের ন্যায় কজ্জল-কৃষ্ণ ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত হইল। তাঁহার হস্তের আন্দোলন ও মুখ-ভঙ্গী ছায়ায় প্রতিবিম্বিত হইল। তখন শত্রুর উত্তেজনা ভ্রম করিয়া বলদেব সত্যই রাগিয়া গেলেন।

"আপন তনু ছায়া হেরি, রেষাবেশ হই,
হু হু পথ ছোড়াই বলি—অঙ্গুলি ঘন দেই।
কর পাঁচনি কক্ষে দাবি, রাঙ্গা ধুলি গায় মাখে,
কা-ক্কা কা-ক্কা কানাইয়া বলি ঘন ঘন ডাকে।"

এই মত্ততা, এই স্খলিত পদ, বিভ্রান্ত বাক্, নিজের ছায়ার সহিত লড়াই, সুদর্শন বলাই-এর গতিবিধি সমস্তই কৃষ্ণপ্রেমের ছাপ-মারা; এজন্য প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম যেরূপ জলের উপর ভাসে, সেইরূপ তাঁহার মূর্ত্তিতে আঁকা কৃষ্ণ-প্রেম সমস্ত উদ্‌ভ্রান্ত ব্যবহারের মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তোত্‌লার কানাই বলিতে কা-ক্কা কানাই ও ধবলী বলিতে ধব-ধব-ধব ধবলী বলিতে যাইয়া মুখে লালা পড়িতেছে, কবি তাহার মধ্যেও অপরূপ সৌন্দর্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

"বলাই এর মুখ যেন বিধুরে, বুক বহি পড়ে মুখের নাল
যেন শ্বেত কমলের মধুরে।"

বলদেবকে দেখিয়া যশোদা ভীত হইলেন, এবার আর কৃষ্ণকে রাখা যাইবে না। তিনি মিনতি করিয়া বলিলেন, "গোপাল অতি শিশু, কোন বোধ-সোধ নাই—

সে কাপড়খানি পর্য্যন্ত পরিতে শিখে নাই, নন্দালয়ে আসিবার পথে কাপড় খসিয়া পড়িলে সে থমকিয়া দাঁড়ায়, এদিকে কাপড় পড়িয়া গিয়া তাহার নুপূরসহ পা দু'খানি বেড়ীর মত জড়াইয়া ধরিয়াছে, হাঁটিতে পারে বা, তখন দু'হাতে চক্ষু ঢাকিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া কাঁদিতে থাকে, এমন অসহায় অবস্থায় আমি কত বার খুঁজিয়া পাইয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া আসিয়াছি, তোরা এমন শিশুকে বিপৎ-সঙ্কুল গোষ্ঠে লইয়া যাইবি কোন প্রাণে?"

যশোদার এই বাৎসল্য অতুলনীয়। কংস-ধ্বংসকারী, বক-কিস্মির-কালীয়-বিধ্বংসী, পুতনারাক্ষসীর স্তনসহ প্রাণ-শোষণকারী, যমলার্জ্জুনোৎপাটক পরম পুরুষবরকে তিনি যে চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা মাতৃ-স্নেহের প্রতীক। মাতা জগজ্জয়ী বীর পুত্রকেও শিশু বলিয়াই মনে করেন। যিনি জগতে মহাবিপ্লব ঘটাইয়া শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন, তিনিও মায়ের কাছে শিশু, তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও আধি-ব্যধি দূর করিবার কথাই শুধু তিনি দিনরাত চিন্তা করেন। যদি মুহূর্ত্ত-কালের জন্য তিনি পুত্রের শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা স্মরণ করেন, তখন জগৎপালনকারী রস-শ্রেষ্ঠ বাৎসল্য আর তাঁহার মনে স্থান পাইতে পারে না। ভগবানের পালনী-শক্তির মূর্ত্ত প্রকাশ সন্তানের প্রতি মমতার অবসান হইলে জগৎ-রক্ষার প্রধান আশ্রয় ভাঙ্গিয়া পড়ে, কুটীরের প্রধান অবলম্বন শালের খুটিটীর অস্তিত্বের বিলোপ হয়। বৈষ্ণব কবিরা সেরূপ রস-ভঙ্গ করেন নাই। একদিন মাত্র যশোদা মুহূর্ত্তের জন্য বিন্দুর মধ্যে প্রতিবিম্বিত ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বিশ্ব-রূপের প্রকাশ বুঝিতে পারিয়া স্নেহ-রিক্তা ও বিস্মিতা হইয়া জগৎ অন্ধকার দেখিয়াছিলেন; তাঁহার ক্রোড়ের অতি ক্ষুদ্র শিশুটির মধ্যে বিশ্ব-শক্তির স্বরূপ দেখিয়া তিনি অধীর হইয়া পড়িয়াছিলেন, এজন্য বাল-গোপাল হাঁ করিয়া মাতাকে যাহা দেখাইয়া চমৎকৃত করিয়াছিলেন, সে রূপ তিনি তখনই সম্বরণ করিলেন।

গৌরদাসের মুখে এই গোষ্ঠ শুনিতে শুনিতে ভগবানকে কিরূপে সখ্য-ভাবে পাওয়া যায়, তাহা আমি আভাসে বুঝিয়াছিলাম। জগৎ তাঁহার লীলাস্থল, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপর নিজকে ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিয়া, তাঁহার সহিত সম্পূর্ণরূপে বৈষম্য-ভাব-বর্জ্জিত হইয়া কিরূপে সেই স্বর্গীয় যোগ দেওয়া যায়, গোষ্ঠগানে তাহা বুঝিয়াছিলাম। এই সখারা কৃষ্ণকে কখনই মান্য করে নাই—("আমরা সামান্য ভেবে কখন মান্য করি নাই" (কৃ), "কত মেরেছি ধরেছি, কাঁধে করেছি, চড়েছি", নিজে ফলটি খাইয়া উহা ভাল লাগিলে উচ্ছিষ্ট তাহার মুখে দিয়াছি "আপনি খেয়ে খাওয়ায়েছি"। এটি বুঝিতে হইবে, বৃন্দাবনের পূজার বিধি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রকম। এখানে ভক্তি-শ্রদ্ধা রসাতলে গিয়াছে, এখন মনের উপর আইন-কানুনের জোর জবর্দ্দস্তি নাই, স্বেচ্ছায় তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিয়া ঠিক নিজের মত ভাবিলে, তবে লীলায় যোগদান করার অধিকার হয়। যদি সখারা প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া গঙ্গা-স্নান করিয়া, নিত্য-নৈমিত্তিক সন্ধ্যা-তর্পনাদি সমাধাপূর্ব্বক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে

গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ দিয়া, নৈবেদ্য সাজাইয়া পূজায় বসিয়া যাইত, তবে কি তাহারা কৃষ্ণের খেরু হইতে পারিত? রাধার পা ধরিয়া কৃষ্ণ মান ভাঙ্গাইতেছেন কিংবা সখারা তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট খাওয়াইতেছেন—একথা বৈধী ভক্তির শাস্ত্রে নাই; গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিতেছেন—"সব অবিধি নদের বিধি"—যাহা কিছু অশাস্ত্রীয় তাহাই নদীয়ার শাস্ত্র। ভক্তি ও প্রেমের রাজ্যে ইহার অধিক স্বাধীন মত অন্য কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া জানি না। চণ্ডীদাস বুঝাইয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে তচ্চিন্তাশীল, তদধিকৃত, তন্ময় ভয়-লাজ-শঙ্কা-বিরহিত ও একান্তভাবে সমতাপন্ন না হইলে কৃষ্ণপ্রেম-লাভ হয় না। এজন্য তিনি রাধার প্রেম-বর্ণনাকালে অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত সমস্ত উপমান ও উৎপ্রেক্ষা অগ্রাহ্য করিয়াছেন—

ভানু কমলে বলি সেহ হেন নহে,
হিমে কমল মরে, ভানু সুখে রহে।
কুসুম-মধুপে বলি সেহ নহে তুল,
না আসিলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল।

চাতক জলদে বলি সে নহে তুলনা,
সময় না হৈলে না দেয় এক কণা।
কি ছার চকোর চাঁদ দুহ সম নহে,
ত্রিভুবনে হেন নাই, চণ্ডীদাস কহে। (চ)

একজন মরিয়া যায়, অপর সুখে থাকে, এ আবার কেমন প্রেম? একজন আসিলে মিলন হইবে, সে না আসিলে অপরে তাহার স্বস্থান ছাড়িয়া একটুও নড়িবে না, সেই প্রসাদাকাঙ্ক্ষীর আবার প্রেমের বড়াই কোথায়? একজন বিন্দু-কৃপার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন, অপরে ঠিক ঘড়ি ধরিয়া তাহার সুবিধানুসারে যৎকিঞ্চিৎ দিবেন, তখন না হইলে দিবেন না, এতো রাজবাড়ীর অতিথিশালার বরাদ্দ-মাফিক ভিক্ষাদান, এখানে প্রেম কোথায়? আর একজন অত্যূর্দ্ধে বসিয়া স্বীয় অপূর্ব্ব বৈভব লইয়া দর্প করিবে, অপর ব্যক্তি ক্ষুদ্রতম ভিক্ষুর ন্যায় তাহার কণা-প্রসাদের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকিবে, দুই জনের পদ-পার্থক্য এতটা হইলে, সম-জ্ঞান না হইলে প্রেম কোথায় পাওয়া যাইবে?

বৈষ্ণব পদে ভক্ত ও দেবতার মধ্যে এক তিল ব্যবচ্ছেদ-রেখা নাই। জগতে বাঙালীর মত আর কোন জাতি ভগবানকে এত আপনার করিয়া দেখিতে সাহসী হন নাই। কৃষ্ণ কখনও যশোদার হাতে, কখনও রাধিকার পদতলে, কখনও সখাদের মার-ধরের মধ্যে কত লাঞ্ছনা পাইতেছেন—সেই অবাধ, সম্পূর্ণরূপ

একাত্মবোধ দ্বারা পরিশোধিত ক্ষেত্রে প্রেমের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। যাহাকে সর্ব্বস্ব দিয়াও কিছু চায় না, তাহার কাছে দর্পহারীর দর্প থাকিবে কিরূপে? তিনি তাহাকে কি দিবেন?—সে শুধু তাঁহাকেই চায়। কি ভয় দেখাইবেন? সে শুধু তাঁহার বিরহকে ভয় করে—এরূপ লোকের কাছে ভগবান পরাজিত।

সখারা যখন বিপন্ন তখনও তাহারা পরম বিশ্বাসে কৃষ্ণের মুখের দিকেই চাহিয়া আছে, তাহাদের বিপদের জ্ঞান নাই, প্রেমের বলে তাহারা নির্ভয় হইয়া গিয়াছে, "আনন্দং ব্রহ্মণো বেত্তা না বিভেতি কদাচন।" অপোগণ্ড শিশু মায়ের কাঁধে মাথা রাখিয়া দুর্গম পথে চলিয়াছে, চারিদিকে ব্যাঘ্রগর্জ্জন, আকাশে কৃষ্ণদৈত্যের মত রাশি রাশি মেঘের ভ্রুকুটী, শিশু নিশ্চিন্ত, সে কোন ভয়ই পাইতেছে না, ভয়-ভাবনা সমস্ত তাহার মায়ের, মাতৃক্রোড়ের দুর্গ আশ্রয় করিয়া সে প্রেমের জোরে নির্ভয়—সখারা কৃষ্ণ-প্রেমে সেইরূপ নির্ভয়, তাহারা কংস-চরের ভয় রাখে না।

গৌরদাসের কীর্ত্তন যে অপূর্ব্ব বৈকুণ্ঠ রচনা করিত, তাহাতে কিছুকালের জন্য আমি পার্থিব সমস্ত কথা ভুলিয়া যাইতাম, তাহাতে বৃন্দাবন-লীলাচ্ছলে ভাগবত তত্ত্ব এমনিভাবে প্রকটিত হইত। চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থেরও পদাবলীর যে সকল স্থানের অর্থ আমি বহুকাল হাতড়াইয়া পাই নাই, এই মূর্খ কীর্ত্তনীয়ার গান তাহা আমাকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিত। গান করিবার সময়ে যেন সে ভাগবত উদ্যানের একটি ভাবকল্পবৃক্ষের মত হইয়া যাইত, তাহার আখরে ও হস্তের ভঙ্গীতে যে লীলার কথা ফুটিয়া উঠিত, সেরূপ মূর্ত্ত মহাকাব্য–দিব্য সঙ্গীত আমি আর কখনও শুনি নাই। অন্য দেশ হইলে, এই গৌরদাসের জন্য কত কি না হইত। সে কথা বলিয়া কাজ নাই। কিন্তু বিলাতের অনুকরণে আমরা জীবন-চরিত-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া যাহাদের গুণকীর্ত্তন করিয়া বড় বড় গ্রন্থ লিখিতেছি ও নব নব সৌধ নির্ম্মাণ করিতেছি, তাঁহাদের মধ্যে কয় জন যে গৌরদাসের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইতে পারেন, তাহা বলিতে পারি না। তবে বহু সরসীতে শতদল পদ্ম ও বনান্তে মল্লিকা, কুন্দ ও মালতী ফুটিয়া অনাদরে শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে, তাই বলিয়া তাহাদের মূল্য যে জগতের কোন মূল্যবান্ বস্তু অপেক্ষা অল্প তাহা কখনই স্বীকার করিব না, আমাদের দৃষ্টিশক্তির প্রসার অল্প, সেই জন্য বিরাট্ জ্যোতিষ্ক-গুলিকে আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর মত দেখিয়া থাকি।

দুই এক মাস পরে পরেই গৌর দাস আমার বাড়ীতে কীর্ত্তন গাহিত। তাহার দল সহ সে আমার আমন্ত্রণে বাড়ীতে আসিত। এই উপলক্ষে প্রতিবারই আমার ৪০।৫০৲ টাকা খরচ হইত। এ টাকা ব্যয় আমার সার্থক ছিল। লোকে দার্জ্জিলিং, শিমলা শৈলে বা ওয়াল্টারে ঘুরিয়া স্বাস্থ্য ফিরিয়া পায়। গৌর দাসের কীর্ত্তন শুনিয়া আমার মনে হইত, আমার মনোতরুর শুক্না পাতাগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে

এবং সবুজ পল্লব দেখা দিয়াছে এবং স্বর্গীয় কুসুমের কুঁড়ি ফুটিতেছে—তাহার সমাগমে আমার মনের মধ্যে এই ঋতু-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতাম। সে আমাকে মর্ত্ত্যলোক হইতে স্বর্গলোকে লইয়া যাইত। আমার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, কালিদাসের কবিতা আমাকে যে সুখ দিয়াছে, ততোধিক আনন্দ দিয়াছে গৌরদাসের কীর্ত্তন।

মনে আছে, একদিন গৌরদাস রূপাভিসারের একটা গান গাহিতেছিল, সেই একটি গান গাহিতে তাহার পুরা তিনটি ঘন্টা লাগিয়াছিল, কিন্তু এই সময়টা যে কি ভাবে গিয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। রাধা সেই গানটিতে শ্রীকৃষ্ণের চোখের ভঙ্গীর কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার সেই নয়নের নৃত্য রাধার সর্ব্বাঙ্গ নাচাইতেছিল—সেই নৃত্যের আসর রাধার দেহ—কত ছন্দে, কত অমৃতাস্বাদী আখরে, সুরের সমস্ত ভাণ্ডার খালি করিয়া সেই চক্ষের নৃত্য চলিতেছিল! সে যে কি আনন্দে কীর্ত্তনটি শুনিয়াছিলাম, তাহা আর কি বলিব, বোধহয় বজ্রপাত হইলে তখন সেই শব্দ আমার কাণে পৌছিত না। যে কণ্ঠ ভগবান স্বয়ং নারদ বা তুম্বুরুর গীতি-যন্ত্রের উপাদানে গড়িয়াছিলেন, তাহা তিনি অকালে ভাঙ্গিলেন কোন্ প্রাণে? গোলাপটি কেনই ফোটে, কেনই বা ঝরিয়া পড়ে কে বলিবে? কোন বিশিষ্ট কীর্ত্তনীয়ার দলের একটি লোক সেই সময়ে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন—গৌরদাসের কীর্ত্তনের সমকক্ষতা করিতে পারে, এরূপ লোক এ যুগে কেহ নাই। যাহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিও গৌরের পায়ের কাছে বসিয়া অনেক বৎসর কীর্ত্তন শিখিতে পারেন।

শুনিয়াছি, গৌরদাস বাঙালাদেশে খোলের ওস্তাদ ছিল, তাহার মত খোল-বাজিয়ে আর কেহ ছিল না। সংগীতাচার্য্য বলিয়াও তাহার খ্যাতি ছিল, এ সকল বিষয় আমার অধিকার-বহির্ভূত। কিন্তু তাহার মত ভাবাবিষ্ট গায়ক আমি আর দেখি নাই। সে কৃষ্ণপ্রেম হরিলুটের মত বিলাইয়া শ্রোতাকে যাদুমন্ত্রে ভুলাইয়া, ঘন্টার পর ঘন্টা আসরে মোহাবিষ্ট করিয়া রাখিতে পারিত এবং অশ্রুর প্লাবনে সকলকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবার শক্তি রাখিত।

## ৯।	হারাই-হারাই

চণ্ডীদাসের রাখা এক দুর্ল্লভ রত্ন পাইয়াছিলেন, সে রত্ন তিনি কোথায় রাখিবেন, এমন নিরাপদ্ স্থান খুঁজিয়া পান নাই। চৈতন্যদেব বার বার তাঁহাকে পাইতেন, বার বার তাঁহাকে হারাইতেন। রাধা যত দুঃখ পাইতেন, যত দূরেই যাইতেন, কৃষ্ণের মুখখানি মনে পড়িলে তাঁহার সমস্ত কষ্ট দূর হইত,

যথা তথা যাই, আমি যত দূর চাই,
চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেকে জুড়াই। (চ)

ননদী ও শ্বাশুড়ীর গঞ্জনা, প্রতিবাসীর বিদ্রুপ—এ সমস্তই সে চাঁদমুখ মনে পড়িলে তিনি আনন্দে সহিতেন। কিন্তু কানু যদি তাঁহার উপর বিরূপ হন, তবে তিনি কি করিবেন? রাধা বলিতেছেন,—

বঁধু, তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও,
মরিব তোমার আগে, দাঁড়াইয়া রও। (চ)

যদি কেহ তাঁহার সম্বন্ধে ভাঙচি দেয়, তবে রাধা তাহাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত দিতেন—

"এ হেন বঁধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়,
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়।" (চ)

কৃষ্ণ-হীনা রাধিকা ফুল-পল্লব-বিরহিত পুষ্পতরু নহে—ততোধিক পরিত্যক্তা—সূর্য্যান্তের পর চন্দ্রতারাহীন নীলাম্বর নহে, ততোধিক আঁধার—ইহা হইতে দুঃখ রাধার কল্পনাতীত, এজন্য রাধা বলিতেছেন, যে আমার এই সুখের ঘরে হানা দিবে—

"আমার হৃদয় যেমন করেছে,
তেমতি হউক সে।" (চ)

ইহা হইতে কষ্ট আর নাই। সংসারের আধি-ব্যাধি, শোক, দুঃখ, মৃত্যু রাধা অবহেলায় সহিতে পারেন; কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমবঞ্চিতা হইলে তিনি তিলার্দ্ধও সহিতে পারিবেন না, এইজন্য এই অভিশাপ তাঁহার অভিধানের সর্ব্বাপেক্ষা বড় অভিশাপ। কৃষ্ণকে একবার রাধা বলিয়াছিলেন, "আমার এই প্রেমের কষ্ট তুমি বুঝিবে কেমন করিয়া, কেমন করিয়াই বা তাহা তোমাকে বুঝাইব, আমি প্রার্থনা করি, যেন জন্মান্তরে আমি কৃষ্ণ হই এবং তুমি রাধা হও, তোমার সঙ্গে প্রেম করিয়া আমি যেন ছাড়িয়া যাই, তখন তুমি বুঝিবে আমার কষ্ট কি?"

সাগরে যাইব কামনা করিব,
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন,
তোমারে করিব রাধা।

পীরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব,
দাঁড়াব কদম্ব-তলে।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাব
যখন যাইবে জলে।
মুরলী শুনিয়া অস্থির হইবে
সহজ কুলের বালা।
চণ্ডীদাস কহে তখন জানিবে—
পীরিতি কেমন জ্বালা।

এই দুঃখের আর কোন উপমা নাই, কারণ তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণ-বিচ্ছেদের মত এমন দুরন্ত অসহ্য কষ্ট আর কিছুই নাই, এ ক্ষেত্রে তাঁহার উপমা তিনি স্বয়ং। সাগর শুকাইলে মহানগরী ধ্বংস হইলে, লক্ষ্মীবন্ত লোক ভিক্ষুক হইলে যাহা হয়, কৃষ্ণত্যক্তা রাধিকার উপমা তাহা দ্বারা ব্যক্ত হয় না, "হে কৃষ্ণ আমি যে কষ্ট পাইতেছি, আমার মত হইলে তাহা বুঝিবে। আমার এই 'সম্বুনদ হেম, সম সেই প্রেম', এই মন বিপ্লবী বাক্যাতীত উপমার ঊর্দ্ধে যে প্রেমলোক—তাঁহাতে যে হানা দেয়, "আমার হৃদয় যেমন করেছে, তেমনি হউক সে।" এইজন্য জন্মান্তরে কৃষ্ণকে রাধা হইয়া তাহার ব্যথা বুঝিতে রাধা প্রার্থনা করিতেছেন, এই পদটিতেও কেহ কেহ চৈতন্যাবতারের পূর্ব্ব সূচনা বুঝিতেছেন, ইহা চণ্ডীদাসের মনে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য-মূর্ত্তির আগমনী গান,—রাধাভাব বুঝিতে কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, এই দুই পূর্ব্ববর্ত্তী কবির এইরূপ পদ আছে, —

“হাম সাগরে তেজঘ পরাণ,
আন জনমে হব কান,
কানু হোরব যব রাযা,
তব জানব বিরহক বাধা।” (চ)

কৃষ্ণপ্রেমে এত আশঙ্কা কেন?

যে কৃষ্ণ “জপিতে তোমার নাম, বংশী ধরি অনুপাম—তোমার বরণের পরি বাস” (চ) প্রভৃতি কত মিষ্ট কথায় রাধাকে সোহাগ করেন, রাধা মান করিলে যিনি চক্ষে সরিষার ফুল দেখিয়া পায় ধরিয়া মান ভাঙ্গান, তাতেও মান না ভাঙ্গিলে রাধাকুণ্ডে পড়িয়া মরিতে যান,—যাঁহার প্রেমের অভাব দেখিলে তিনি জগৎ আঁধার দেখেন এবং “রাধা তুমি সে আমার গতি, তোমার কারণে, বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া গোকুলে আমার স্থিতি” (চ) প্রভৃতি পদে তাঁহার রাধাগত প্রাণের গৌরব করেন, কখনও বা “যমুনা তীরে, নীপহি মূলে” রাধা পরিত্যক্ত “লুটত বনওয়ারী, চূড়া এই ঠাঁই, বাঁশী এক ঠাঁই”—“ধূলি ধূসর কহত প্যারী প্যারী” (রায়)—এত কষ্টেও রাধা নামটি ছাড়িতে পারেন না, সে রাধার এই আশঙ্কা কেন? কেন রাধিকা কৃষ্ণের ভাবান্তর কল্পনা করিয়া “তুমি বঁধু মোরে যদি নিদারুণ হও, মরিব তোমার আগে, দাঁড়াইয়া রও” এইরূপ প্রলাপোক্তি করেন?

চণ্ডীদাসের রাধা ভগবৎপ্রেমের প্রতীক। তিনি সময়ে সময়ে কৃষ্ণ-সঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হন, কিন্তু সে প্রেমের মধ্যে একটা না পাওয়ার আশঙ্কা থাকে। যোগীর হৃদয়ে সেই অবাঙ্‌মনসাগোচর ভগবান বিদ্যুতের মত ক্ষণিক প্রভা দিয়া অন্তর্হিত হন। বৈষ্ণব প্রেমিকের মত তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিবার গৌরব যোগী কোথায় পাইবেন? রাধা-সাহিত্য মিথ্যা ইহয়া যাইত, যদি চৈতন্য প্রভু নিজের মধ্যে রাধা-ভাব না দেখাইতেন; তিনি অনেক সময়ে তাঁহার চোখের ইঙ্গিতে কৃষ্ণসঙ্গের অপ্রমেয় অথচ জটিল, নিগূঢ় অথচ ঈষৎপ্রকাশিত আনন্দ আভাষে ব্যক্ত করিয়া দেখাইতেন। তাঁহারই সঙ্গে লীলা-মাধুরী—কোপ, মান, অভিমান, খণ্ডিতার নিদারুণ কষ্ট, বিরহের অসীম-কারুণ্যমথিত মাথুর-ভাব, এ সমস্তই ক্ষণে ক্ষণে চৈতন্যের নয়ন-কোণে ফুটিয়া উঠিত। রূপ-গোস্বামী তাঁহার দান-লীলা-কৌমুদীর মুখবন্ধে নয়টি রস-মিশ্র কিলকিঞ্চিৎ ভাবের যে চিত্র আভাষে আঁকিয়াছেন, তাহা চৈতন্যের ভাবাবিষ্ট অবস্থায় চোখের চাহনী হইতে পাওয়া। কৃষ্ণসঙ্গ পাইয়া যিনি অকূল আনন্দ-সায়রে ঝাঁপ দিয়াছেন, সেই ভাবের অবসানে তিনি যে অসীম কষ্ট পাইয়াছেন, তাহার চিত্র চৈতন্যচরিতামৃতে আছে। তিনি গাম্ভীরায় মুখ ঘষিয়া রক্তাক্ত করিয়া ফেলিতেন এবং সারারাত্রি স্বরূপ দামোদর ও রাম রায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের বিলাপগীতি গাহিয়া কাটাইতেন।

যিনি অবাঙ্‌মনসাগোচর, অসীম—অনন্ত, তাঁহাকে জীব কতক্ষণ নিজের কাছে বাঁধিয়া রাখিবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে? তাই সিড়ি ভাঙ্গীয়া উর্দ্ধলোকে উঠিয়া পতনের আশঙ্কা একবারে যায় না। জীবের পক্ষে স্থায়ী ভাবে শিবলোকে বাস করা সম্ভব নহে—

“কৃষ্ণরূপে মূর্ত্তি যখন দেখেন নয়নে,
তখন ভাবেন কৃষ্ণ আছেন বৃন্দাবনে,
অদর্শনে ভাবেন কৃষ্ণ গেছেন মধুপুরী।” (কৃ)

এই বিরহের অবস্থায়

“ক্ষণে গোরাচাঁদ, হয়ে দিব্যোম্মান—দুটি চক্ষে ধারা বহে অনিবার, দুঃখে বলে বারবার, স্বরূপ দেখায়ে একবার, নতুবা এবার মরি।” (কৃ) বিরহে তিনি কখনও মুর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তখন ভক্তমণ্ডলী গাহিতেন,

“গৌর কেন এমন হল,—(স্বরূপের সাথে) এই না কৃষ্ণ কথা কহিতেছিল, তোরা দেখে যা গোরা বুঝি প্রাণে মৈল।”

সুখের সাগর দেখাইয়া–পূর্ণানন্দের আস্বাদ দিয়া কৃষ্ণ লুকাইয়া পড়েন। ভাব-রাজ্যে তাঁহার এই লুকোচুরী খেলা গৌর-জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে।

রাধিকা তাঁহার সর্ব্বস্ব কৃষ্ণের পায়ে “কৃষ্ণার নমঃ” বলিয়া ডালি সাজাইয়া দিয়াছেন। বিদ্যাপতির রাধা বলিতেছেন-

“হাতক দরপণ মাথক ফুল,
নয়নক অঞ্জন, মুখক তাম্বুল,
হৃদয়ক মৃগমদ, পীমক হার,
দেহক সরবস্ব, গেহক সার,
পাথীক পাণ, মীনক পানী,
জীবক জীবন হাম তুরা জানি।”

অর্থাৎ “তুমি আমার সব, পাখীর পাখা না হইলে উড়িবার শক্তি লোপ পায়, সে মাটীতে পড়িয়া মরে, মৎস্যকে জল হইতে ডাঙ্গায় তুলিলে সে কতক্ষণ বাঁচে? তুমিও আমার কাছে সেইরূপ।” চণ্ডীদাসও লিখিয়াছেন,

"জল বিনু মীন জনু কবহ না জীয়ে"।

রাধা নানা উপমায় নিজের প্রেম বুঝাইয়া বলিয়াছেন:—

"জীবক জীবন হাম তুয়া জানি" "তুমি আমার জীবনের জীবন, আমি ইহাই জানি।"

এত কথা বলিবার দরকার কি? দরকার কিছু ছিল, "আমার সম্বন্ধে বুঝাইবার কিছু নাই, তুমি সকলই জান", তোমা ছাড়া রাধা কায়া-ছাড়া ছায়া—তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। "আমার মনের ভাব পরিষ্কার, কিন্তু তুমি কেমন, তাহা তো এত দিন ধরিয়াও বুঝিতে পারিলাম না। আমি সকল বিসর্জ্জন করিয়াও সোয়াস্তি পাইতেছি না। আমি কাহার হাতে সর্ব্বস্ব দিলাম, কে সে বিরাট্ প্রহেলিকা, তাঁহাকে তো আমি এখনও চিনিতে পারিলাম না।" তাঁহাকে রাধা কত গাল মন্দ দিয়াছেন, "ক্রুর, লম্পট, শঠ,"—এ সেই না চিনার জন্য, বিদ্যাপতির রাধা এই পদের শেষ ছত্রে আর্ত্ত স্বরে জিজ্ঞাসু হইয়াছেন:—

"মাধব, তুহু কৈছে কহবি মোর" তুমি বল তুমি কেমন? তুমি কে? এই চির-রহস্যময় বিশ্বের কারণস্বরূপ ভগবানের সঙ্গে লীলাচ্ছলে নানা অভিনয় করিয়াও যে একটা খোঁচার মত সন্দেহ মনে থাকয়া যায়—এই সন্দেহ, এই আশঙ্কা হইতেই মাথুরের উৎপত্তি।

আমি তো তাঁহাকে ভালবাসিয়াছি, সে তো বিন্দুর সিন্ধুকে ভালবাসা। আমি তাঁহাকে সমগ্রভাবে চাই—সেই যমুনাতীরকুঞ্জে যত অমৃতোপম কথা শুনিয়াছিলাম, বংশীধর "পরশিতে চাই তোমার চরণের ধূলি" বলিয়া আমার পায়ে ধরিয়া সেবা করিয়াছিলেন,—মাতৃরূপে, সখারূপে তিনি জীবকে সমগ্রভাবে ভালবাসার স্বপ্ন দেখাইয়া থাকেন। আমি যেন তাঁহার সব,

"জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাতি, জাগি পোহাইত রাতি,
তিল নাহি যায় পিয়া ঘুম," (ব)
ধরিয়া দুখানি হাতে, কখন ধরয়ে মাথে,
ক্ষণে ধরে মাথার উপরে,
ক্ষণে পুলকিত হয়, ক্ষণে আঁখি মুদে রয়
বলরাম কি কহিতে পারে?"
"বিনি কাজে কত পুছে, কত না মুখানি মোছে"
"তুমি মোর প্রাণধন, তোমা বিনা নাহি আন,
কহে পিয়া গদ গদ ভাবে।" (ব)

কত ছন্দ-বন্ধে নানা কথা বিলয়া আমাকে ভুলাইয়াছিলেন, কত রাত্রি জাগিয়া অভিসারের পথে "পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে" আমার পদক্ষেপ শুনিবার জন্য কাণ পাতিয়া প্রতীক্ষা করিয়াছেন, কত তিমির রজনীর মেঘের ঘটা, পিচ্ছিল বাটে অতি সন্তর্পণে আসিয়া আমার আঙ্গিনার এক কোণে অপরাধীর মত দাঁদাইয়াছেন, সেই প্রেমের কল্পতরু আমাকে বুঝাইয়াছিলেন, তাঁহার সকল ফুল-ফল আমারই প্রেমের নৈবেদ্য, আমি ছাড়া তাঁহার আর কেহ নাই—আমারও যেমন তাঁহাকে ছাড়া আর কেহ নাই! কিন্তু তিনি যদি তাহা না হন? তিনি যে জগদীশ্বর—সমস্ত জগতের, আমার মত তাঁহার শত শত আছে,

"আমার মতন তোমার অনেক রমণী
তোমার মত আমার তুমি গুণমণি,
যেমন দিনমণির অনেক কমলিনী,
(কিন্তু) কমলিনীগণের ঐ একই দিনমণি।"

তবে কি আমি শত শত কোটীর একজন?

এই অবস্থায় রাধা অতি ব্যাথা সহকারে বলিতেছেন

"রাধানাথ বলিতে ভয় হয় চিতে, তাই গোপীনাথ বলিয়া ডাকি।"

আমায় যদি বহুর মধ্যে একজন হইয়া তাহার প্রেমের ভিখারী হইতে হয়, তবে তো আমি প্রাণে মরিব,—

"রাধা ভাগের প্রেম নেবে না।"

কাহাকে সর্ব্বস্ব দিলাম, সে কি সত্যই বিরাট্? হিমাদ্রির পাদমূলে মাথা ঠেকাইয়া—আমি নগণ্য—নিলাম হইয়া গেলাম, এত ক্ষুদ্রকে সেই বিরাট্ পুরুষ কি মনে রাখিবেন? "দুঁহু সম" না হইলে প্রেম হইবে কিরূপে? ক্ষুদ্রের ভালবাসার আর গৌরব কি? মহানের কাছে অণু হইয়া কৃপাকণার জন্য ভিক্ষুক সাজিব? বিদ্যাপতির রাধার ন্যায় চণ্ডীদাসের রাধাও বলিতেছেন:—

আমি তোমার জন্য,

"ঘর কৈনু বাহির, বাহির কৈনু ঘর,
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর।

রাতি কৈলাম দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি।”

নিজের রাজতুল্য স্বামীর ঘর ছাড়িয়া আমি যমুনার তীরে শ্যাম কুণ্ড—স্পৃষ্ট অনিলবাসিত কুঞ্জই গৃহ বলিয়া জানিয়াছি——সে তোমারই জন্য, যাঁহারা আপন তাঁহাদিগকে পর মনে করিয়া তুমি একান্ত পর (পরাৎপর) তোমাকে আপন জ্ঞান করিয়াছি। দিনের বেলা ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিনকে রাত্রি করিয়াছ, তোমার জন্য সারা রাত্রি কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরিয়া জাগরণ করিয়াছি, রাত্রিই আমার কাছে দিন হইয়াছে। এ তো তোমারই জন্য, হে মাধব, এত করিয়াও “বুঝিতে নারিনু বঁধু তোমার পীরিতি” তুমি আমার কাছে রহস্যই রহিয়া গিয়াছ।

এই সংশয় রাধার সমস্ত যন্ত্রণার মূলে। এজন্য একটা ‘হারাই’-‘হারাই’ ভাব চণ্ডীদাসের অনেক গানে দৃষ্ট হয়। যাহা অতি মূল্যবান্, তাহা লইয়া এজন্য লোকে সোয়াস্তি পায় না; আঁচলের গেরো খুলিয়া এজন্য সে বারংবার দেখে, তাহা কেউ লইয়া গেল কি না। বিশ্বনাথকে লইবার জন্য তো বিশ্বের সকলেই হাত পাতিয়া আছে।

এই সন্দেহ সর্ব্বত্রই গভীর প্রেমের লক্ষণ। অপোগণ্ড শিশুও তাহার মায়ের কোলে পাছে অপরে উঠে, এজন্য উৎকণ্ঠিত থাকে। চণ্ডীদাসের রাধা বলিতেছেন:—

“এই ভয় উঠে মনে, এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে যেন ছুটে।”

১০। সখী-সম্বোধনে

সখীদের কাছে রাধা কখনও বলিতেছেন, তোমরা আমার নিন্দার কথা শুনিয়া কষ্ট বোধ করিতেছ, কিন্তু কানুর কলঙ্ক—আমার অঙ্গের ভূষণ, এ নিন্দা আমার সৌভাগ্য:—

"কানু-পরিবাদ মনে ছিল সাধ,
সফল করিল বিধি।"

আমার এই কলঙ্কে যাঁহারা আমাকে ঘৃণা করিবেন, আমি তাঁহাদের কাছে বিদায় চাহিতেছি—

"দেখিলে কলঙ্কীর মুখ কলঙ্ক হইবে,
এজনার মুখ আর দেখিতে না হবে।
ফিরে ঘরে যাও নিজ ধরম লইয়া,
দেশে দেশে ফিরিব আমি যোগিনী হইয়া
কালো মাণিকের মালা তুলে দিব গলে,
কানুগুণ-যশ কাণে পরিব কুণ্ডলে।
কানু-অনুরাগ-রাঙ্গা বসন পরিব,
কানুর কলঙ্ক ছাই অঙ্গেতে মাখিব।"

এখানে গেরুয়া পরা, ভষ্ম মাখা, যোগিনী হওয়া—এ সমস্তই আধ্যাত্মিক সম্পদের আভাষ। চণ্ডীদাস যে রেখাপাত করিলেন, কিছু দিন পরেই তাহা এক সুবর্ণচ্ছবি গৌরকান্তি পুরুষ-রূপে দেখা দিল কৃষ্ণ নামই তাঁহার কর্ণের কুণ্ডল, কৃষ্ণ-অনুরাগেই তাঁহার রাঙ্গা বাস এবং কৃষ্ণ-কলঙ্কই সেই তরুণ সন্ন্যাসীর অঙ্গের ভষ্ম হইয়াছিল।

এই কৃষ্ণের কলঙ্কের কথা তিনি সখীদের কাছে এবং আত্মনিবেদনের অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন—

"কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুঃখ
বঁধু তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।"

বস্তুতঃ যদিও কৃষ্ণের কালোবর্ণের কথা অনেক পুরাণে উল্লিখিত আছে কিন্তু বাঙ্গলায় এই বর্ণটি বিশেষ ভাবে ভগবানের স্মারক হইয়া পড়িয়াছিল। চৈতন্যের পূর্ব্বে মাধবেন্দ্র পুরী কালোমেঘ দেখিলে মূর্চ্ছিত হইতেন। কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত শত শত বাসুদেব মূর্ত্তি অত্যাচারীর কুঠারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছিল, প্রাণপণ করিয়াও এই সকল বিগ্রহ পূজারীরা রক্ষা করিতে পারেন নাই। বাঙ্গলার এক পুকুরে দেখা গিয়াছিল—এক ভগ্ন কৃষ্ণ প্রস্তরের বাসুদেবকে কতকগুলি নরকঙ্কাল জড়াইয়া ছিল, অত্যাচারীরা বিগ্রহরক্ষাকল্পে যে সকল পুজারী প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াছিল, তাঁহাদের শবদেহ সহ মূর্ত্তি পুকুরে ফেলিয়া দিয়াছিল। মন্দির শ্রীবিগ্রহশূন্য হইলে কৃষ্ণ-মূর্ত্তি জগতের সর্ব্বস্থান হইতে ভক্তদের চোখে ধাঁধাঁ দিয়া তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিল, তাঁহাদের প্রাণের দরদে আঁকা কৃষ্ণমূর্ত্তি নব মেঘে বিরাজিত হইতেন, নীলাঞ্চলেও সেই রূপ প্রতিভাত হইত, কালো যমুনার জলে সে রূপ ঝলমল করিয়া উঠিত। ভক্ত-প্রাণে তাঁহাদের মন্দিরের আরাধ্য দেবমূর্ত্তি বড় দাগা দিয়া গিয়াছিল; এজন্য জগতের যেখানে কালো বর্ণ দেখিতেন, সেইখানে তাঁহারা প্রিয়তম দেবতাটিকে মনে করিতেন। চণ্ডীদাসের রাধা বলিতেছেন:—

“কালো জল ঢাল্‌তে সই কালো পড়ে মনে,
দিবানিশি দেখি কালা শয়নে স্বপনে।
কালো চুল এলাইয়া বেশ নাহি করি,
কালো অঞ্জন আমি নয়নে না পরি।””

বিগ্রহ বিচ্যুত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ জগন্ময় পরিব্যপ্ত হইয়াছিল।

সখীর প্রতি উক্তির কোন কোনটিতে প্রেমের সর্ব্বোচ্চ কথা উচ্চারিত হইয়াছে:—

“কানু সে আমার জাতি, কুল, মান,
এ দুটি নয়নের তারা,
আমার হিয়ায় মাঝারে, হিয়ার পুতলী,
নিমিষে নিমিষে হারা।
তোরা কুলবতী ভজ নিজ পতি,
যার যেবা মনে লয়,
আমি ভাবিয়া দেখিলাম, শ্যাম বধু বিনে
গতি আর কেহ নয়।”

কি আর বুঝাও ধরম করম,
মন স্বতন্তর নয়,
কুলবতী হৈয়া, কুলে দাঁড়াইয়া,
মোর মত কেবা হয়।
গুরু পরিজন, বলে কুবচন,
সে বাসি চন্দন চুয়া,
কানু-অনুরাগে এদেহ সঁপেছি,
তিল-তুলসী দিয়া।
পরশী দুর্জ্জন বলে কুবচন,
আমি না যাব তাদের পাড়া,
কহে চণ্ডীদাস কানুর পীরিতি
জাতি-কুল-শীল ছাড়া।”

কানুই আমার জাতি, কুল ও শীল, আমি অন্য জাতি মানি না, আমার শীল (আচার)ও তিনি। আমার হৃদয়ে তিনি হৃদয়ের বিগ্রহ, পলকে পলকে আমি তাঁহাকে হারাই—নিরবধি একই চিন্তা। তোমরা কুলে আছ, নিজ নিজ স্বামীকে যথেচ্ছা ভজনা কর, কিন্তু গার্হস্থ্যসুখ আমার কপালে নাই। আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, কৃষ্ণই আমার একমাত্র অবলম্বন, তিনি

“মোর গতি, তিনি মোর পতি
মন নাহি আন ভায়।”

ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা কি বলিতেছ, আমার ও সকল জানিবার ও শিখিবার আর কিছুই নাই, আমার মন স্বতন্তর (স্বাধীন) নহে, মন একান্ত পক্ষে তাঁহার অধীন হইয়া গিয়াছে। তোমাদের কোন উপদেশের অবকাশ নাই, আমি সম্পূর্ণ-রূপে তদধীন। কুলের বধুকে আমার মত এরূপ হইতে দেখিয়াছ কি? কুল থাকিতেও আমি অকূলে ভাসিয়াছি। গুরুজন আমায় কটূক্তি করেন, তা করিবেনই তো, তাঁদের দোষ কি? সে কটূক্তি আমার পক্ষে চুয়া-চন্দন, আমি কানু-অনুরাগে দেহ মন তাঁহাকে নিবেদন করিয়া দিয়াছি।

প্রতিবাসীরা নিন্দা করে, করুক—আমি তাহাদের পাড়ায় যাইব না। চণ্ডীদাস বলিতেছেন, সে কানুপ্রেমে পড়িয়াছে, তাহার জাতি-কুল-শীল সব গিয়াছে।

এই পদটি খুব উচ্চাঙ্গের, কৃষ্ণ প্রেমিকের ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছু থাকে না। চণ্ডীদাসের আর একটি পদে আছে—

"মরম না জানে ধরম বাখানে, এমন আছয়ে যারা।
কাজ নাই সখি, তাদের কথায়, বাহিরে রহন তারা।
আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে,
ভিতর দুয়ার খোলা।"

যিনি ঈপ্সিতকে পাইয়াছেন,—তাহার বহিরিন্দ্রিয়ের খেলা থামিয়া গিয়াছে। মোহনা পর্য্যন্ত ডাক-হাক, কিন্তু নদী যখন সমুদ্রে পড়িয়াছে—তখন তাহার রব সমুদ্রের রবে মিশিয়া গিয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র অস্তিত্ব দিগন্তপ্রসারী বিশাল জলধারার অস্তিত্বে মিশিয়াছে, তখন তাঁহার গতি থামিয়াছে—কর্ম্ম সমাপ্ত হইয়াছে, ভাল-মন্দের এ-পথ ও-পথের বিচার চলিয়া গিয়াছে। তখন—"কি আর শিখাও—ধরম-করম" এবং তখন "কহে চণ্ডীদাস পাপ-পুণ্য সম, তোমার চরণ মানি।" পাপ-পুণ্যে ভেদ নাই, তোমার চরণপদ্মই আমার সব।

"কানু অনুরাগে এ দেহ সঁপেছি, তিল-তুলসী দিয়া",

তিল-তুলসী দিয়া যে দান হয়—তাহা ফিরিয়া লইবার আর অধিকার থাকে না। রাধা সেই ভাবে তাঁহার দেহ কৃষ্ণকে সমর্পণ করিয়াছেন, দেহ এই ভাবে নিবেদিত হইলে কর্ণ কেবল তাঁহারই প্রিয় কথা শুনিবে, চক্ষু তাঁহার রূপ দর্শন করিবে, চরণ তাঁহারই মন্দিরের পথে যাইবে, জিহ্বা তাঁহারই নামের আস্বাদ করিবে। সর্ব্বেন্দ্রিয় সহ দেহ তিনি "কৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিয়া দিয়াছেন, তাহার উপর আর তাঁহার কোন সত্ত্বা নাই। এরূপ নির্ব্যূঢ় সত্ত্বে যিনি নিজেকে দান করিতে পারিয়াছেন, তিনি অবশ্য প্রেমের তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

সুতরাং যখন কানুকে ভালবাসি বলিয়া লোকে নিন্দা করে, তখন তাহা রাধার শাপে বর:—

"সবে বলে মোরে কানু কলঙ্কিনী, গরবে ভরয়ে দে।
হামার গবর তুঁহু বাড়াইলি, অব টুটায়ব কে।"

মাথুর

কৃষ্ণ মথুরায় গিয়াছেন, মন্দির খালি, বৃন্দাবন শূন্য।

"কৈছনে যাওব যমুনাতীর,
কৈহে নেহারব কুঞ্জকুটীর
সহচরি সঞে যাহা করল ফুল-খেরী।
কৈছনে জীয়ব তাহি নেহারি।"

সে ফুল-খেলা ফুরাইয়াছে—তোমার বিলাসকুঞ্জের দিকে চাহিয়া কেমন করিয়া জীবন রাখিব? আর কাহার সহিত নীলাম্বরতলে সন্ধ্যানিলবাহিত যমুনাতীরে হাত-ধরাধরি করিয়া বেড়াইব?

বৃন্দাবনচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন, বৃন্দাবন আঁধার হইয়াছে, এই প্রসঙ্গের গৌর-চন্দ্রিকা।

"কার ভাবে কিসের অভাবে গৌর আমার এমন হৈল
নবদ্বীপচন্দ্র বিনা নবদ্বীপ আঁধার হৈল।"

কাহার জন্য প্রত্যুষে উঠিয়া সদ্যস্নাতা রাধা মালার জন্য পুষ্পকুঞ্জে ফুল কুড়াইবেন? কাহার শ্রীমুখ অলকা-তিলকা দিয়া সাজাইবেন? চন্দন ঘষিয়া কপালে বিন্দু আঁকিয়া দিবেন? কাহার জন্য ফল-ফুলের নৈবেদ্য তৈরী করিবেন? কাহার জন্য সদ্যবিকশিত শতদলের প্রতিটি দল লইয়া সযত্নে পুষ্পশয্যা তৈরী করিবেন? মিলনপর্ব্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—বিগ্রহ অপহৃত হইয়াছে।

এমন যে হইবে, কে জানিত?

"আমারে ছাড়িয়া পিয়া, মধুরায় রইল গিয়া—
এও বিধি লিখিলা করমে।"

আমার কর্ম্মে—আমার ভাগ্যে ইহাও লেখা ছিল, আমি কৃষ্ণ-হারা হইয়া বাঁচিয়া থাকিব?

বিদ্যাপতি মাথুরের প্রথম অধ্যায়ে ভগবদ্ভাবে আবিষ্ট হইয়া লিখিয়াছেন,

"হরি হরি কি ইহ দৈব দুরাশা।

সিন্ধুর নিকটে যদি কণ্ঠ শুকায়ব, কো দূর করব পিপাসা?
চন্দনতরু যব সৌরভ ছোড়ব, শশধর বরখিব আগি।
চিন্তামণি যদি নিজ গুণ ছোড়ব কি মোর করম অভাগী।
শাওন মাহ ঘন, যব বিন্দু না বরখব, সুরতরু বাঁঝ কি ছাদে।
গিরিধর সেবি, ঠাম নাহি পাওব, বিদ্যাপতি রহ ধন্দে।"

এখানে একটু ঐশ্বর্য্যের ভাব আছে—তিনি এই বিরাট্, তাঁহার কাছে আসিয়া বঞ্চিত হইতে হইবে, এমন তো কখনও ভাবি নাই। এই সুললিত শব্দে গ্রথিত কাব্যরসপূর্ণ পদটির মধ্যে যেন একটু

"যাচঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধ কামা"

গন্ধ পাওয়া যায়। যিনি সিন্ধুর মত বিরাট্ তাঁহার কাছে বিন্দু পাইব না, এই আক্ষেপে দেখা যায়, রাধা যেন কৃষ্ণ-প্রেমের কণিকা ভিখারী। শ্রাবণ মাসের ভরা বাদরের অজস্র বর্ষণশীল আকাশের কাছে কণিকামাত্র জলের প্রত্যাশা নাই, ইহাও কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যব্যঞ্জক। সুরতরু (কল্পবৃক্ষ) আমার কাছে বন্ধ্যা হইয়া রহিল, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম মোক্ষের দাতা ভগবানকে কল্পতরু বলা হইয়াছে—তিনি কাম্য ফল প্রদান করেন। এখানেও রাধার প্রার্থীর বেশ, রাধা তাঁহার নিকট কাম্যবস্তুর সন্ধানে আসিয়াছেন, এখানে নিষ্কাম অহেতুক গোপী-প্রেমের আভাষ নাই। শেষ ছত্রে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে—সর্ব্ব শক্তিমান, সর্ব্ব-ইষ্ট-প্রদায়ী ভগবানকে সেবা করিয়া কোনই ফল পাওয়া গেল না, কবি এ রহস্যের সমাধান করিতে পারিতেছেন না।

কিন্তু কৃষ্ণ যতই বড় হউন না কেন, গোপী তাঁহার বিরাট্ রূপ দেখিতে চায় না, তাহারা তাহাকে পঞ্চ রসের মধ্য দিয়া দেখিতে চায়; মাতা রূপে তিনি যেমন আমারই মা, স্ত্রীরূপে তিনি যেমন আমারই স্ত্রী, সেই রূপ তিনি আমারই হইয়া আসিলে, আমি তাঁহার নাগাল পাইতে পারি। তিনি অণুর কাছে সম্পূর্ণরূপে অণু হইয়া ধরা দেন, ব্যবধান থাকিলে গলাগলি ভাব হয় না, বৈষ্ণব প্রেমের আদর্শ ছোট ও খর্ব্ব হইয়া যায়।

চণ্ডীদাস বলিয়াছেন,

"তোমারই গরবে গরবিনী হাম, রূপসী তোমার রূপে"

এই ছত্র কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার তন্ময়ত্ব-জ্ঞাপক। তাঁহার রূপ, গুণ, সকলই কৃষ্ণ হইতে পাওয়া। অগ্নির সঙ্গে তাপের, চন্দ্রের সহিত জ্যোৎস্নার পরস্পরে যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের তাহাই; রাধা কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি।

রূপের স্পৃহা, দেহের সঙ্গ-সুখ, বাহিরের সেবা-স্তুতি, হোম, যাগ, যজ্ঞ, বৈধী ভক্তির সমস্ত আয়োজন মাথুরে লুপ্ত। জগন্নাথ বিগ্রহ অত্যাচারীরা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। কাশীর বিশ্বনাথ আজ অপহৃত। এখন প্রত্যুষে উঠিয়া বন্দীরা সুললিত স্বরে কাহাকে জাগাইবে, কাহার জন্য প্রভাতী গান গাহিবে? ছত্রধারিণী, তাম্বুল বাহিকা, ব্যজনকারিণীরা কাহার সেবায় নিযুক্ত হইবে? দেবভোগ রাঁধিবার জন্য সূপকারেরা আর কেন আয়োজন করিবে? মালীরা শত শত মালা হাতে লইয়া স্তব্ধ হইয়া আছে। মন্দির আর নাই—যজ্ঞকুণ্ড নাই, হোমাগ্নি নিবিয়া গিয়াছে।

তবে কি মাথুরে গোপীপ্রেমের পরিসমাপ্তি, এখন কি শুধু আক্ষেপোক্তি ও অশ্রুতেই গোপীপ্রেম পর্য্যবসিত হইল? ক্রূরতার অবতার অক্রূর আসিয়া কি এই ভাবেই বৃন্দাবনের প্রেমের হাট ভাঙ্গিয়া দিয়া গেলেন? শাস্ত্রে অবশ্যই এ কথা লিখিত আছে, মথুরা হইতে কৃষ্ণ আর ফিরিয়া আসেন নাই। কিন্তু বাঙ্গালীরা কৃষ্ণের মথুরা যাওয়া অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কৃষ্ণ "বৃন্দাবন পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি"। "মাথুর" তাঁহাদের মতে বৃন্দাবনের নিত্যলীলায় প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা রসাস্বাদের জন্য পরিকল্পিত। কৃষ্ণকমল লিখিয়াছেন,—

"গোস্বামী-সিদ্ধান্ত মতে স্বয়ং ভগবান,
বৃন্দাবন ছাড়ি এক পদ নাহি যান।
তবে যে গোপিকার হয় এতই বিষাদ।
তার হেতু প্রোষিতভর্ত্তৃকা রসাস্বাদ।"

মাথুরের পর শাস্ত্রানুসারে বৈষ্ণবদের সমস্ত কথা শেষ। প্রেমলীলার তাঁহাদের আর কিছু বলিবার থাকে নাই। যে ছেলেটি একটা বাঁশের আগা কাটিয়া বাঁশী বানাইত, নেংটির মত ধটি পরিত, বৃন্দাবনের মাঠে কুড়াইয়া পাওয়া ময়ুরের পালক মাথায় দিয়া গোয়াল-বালকদের মধ্যে রাজা সাজিত, বনে বনে ঘুরিয়া বনফুল ও গুঞ্জা ফলের মালা গাঁথিয়া গলায় পরিত এবং যশোদার হাতে ননী মাখন খাইত—সেই পাড়াগেঁয়ে মোড়লের ছেলে হঠাৎ আবু হোসেনের মত একদিনের মধ্যে সমস্ত মথুরামণ্ডলের রাজ্যটা পাইল। আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে এত বড় সাম্রাজ্য আর কোথাও ছিল না। যাহাকে বলাইদা একটা শিঙা ফুকাইয়া "কাক্কা

কানাইয়া” বলিয়া ডাকিলে সে দাদার পিছনে পিছনে ছুটিত, সখাদের উচ্ছিষ্ট খাইত, সখারা দ্বন্দ্ব করিয়া যাহাকে লাথি মারিত কিংবা খেলার সময়ে ঘাড়ে চড়িয়া বসিত, যে গয়লা-মেয়েদের সঙ্গে লুকাচুরি খেলিত—সেই ছোঁড়াটা এখন রাজরাজেশ্বর—নয় মহাল পাড়ি দিয়া সপ্ততল অট্টালিকায় সে এখন বাস করে; শত শত রক্ষী সোণার লাঠী হাতে করিয়া তাহার মহালে মহালে পাহারা দেয়: ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, এমন কি ব্রহ্মাও তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া এতেলা দিয়া প্রতীক্ষা করেন। বৃন্দা যখন কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল, তখন মথুরাবাসিনীরা টিটকারী দিয়া তাহাকে বলিয়াছিল—

“সপ্ততল ঘর, উপরে সো বৈঠত, তাহা কাঁহে যাওব নারী”

প্রভাস-যজ্ঞে নন্দ উপানন্দ, এমন কি স্বয়ং মা যশোদা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া প্রহরীদের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া যাঁহার দরবারে প্রবেশের পথ খুঁজিয়া পান নাই, যাঁহার কথা বলিতে যাইয়া রাধিকা কাঁদিয়া বলিয়াছেন,

“আমরা গ্রাম্য গোপবালিকা, সবহ পশুপালিকা,
আহিরিণী কুরূপিনী—আমরা কৃষ্ণসেবার কিবা জানি।
মথুরানগর-যোষিতা, সবহ তারা পণ্ডিতা,
তারা রূপ-গুণে বেঁধেছে গো,

এই রাজকুল সম্ভবা ষড়-রসজ্ঞা মথুরাবাসিনীদের দ্বারা তিনি বেষ্টিতা।

“তাবৎ অলি গুঞ্জরে, যাই ফুল ধুতুরে,
যাবৎ মালতী নাহি ফুটে”

এখন আর তিনি এখানে ফিরিবেন কেন?

সুতরাং মাথুর পালার পরে রাধাকৃষ্ণ লীলার সম্পূর্ণ ছেদ হইবার কথা।

কিন্তু এদেশে মহাপ্রভু লীলা করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে মাধবেন্দ্র পুরী প্রেমের সেই রাজরাজেশ্বরের মধুকর ডিঙ্গার জন্য খাত কাটিয়া গিয়াছিলেন। এখানে ব্রজের নাম “নিত্য বৃন্দাবন,” কৃষ্ণলীলার এখানে অন্ত স্বীকৃত হয় নাই। শাস্ত্র মানিয়া যেখানে অন্যান্য দেশের বৈষ্ণবেরা সম্পূর্ণ বিরাম-চিহ্ন দিয়াছিলেন, বাঙ্গালী তাহা মানিয়া লইল না।

এখানে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস "ভাব-সম্মেলন" নামক মাথুরের পরে আর একটা অধ্যায়ের সৃষ্টি করিয়া পূজার ঘরের হোমানল জ্বালাইয়া রাখিলেন। এই আহিতাগ্নিকদের পবিত্র অগ্নির নির্ব্বাণ নাই। রাধিকা দেহ-সম্বন্ধ-বিচ্যুত হইয়া চিন্ময় রূপে ভগবানকে ফিরিয়া পাইলেন, ইহাই "ভাবসম্মেলন"। পূর্ব্বে শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড ও মদনকুঞ্জের নিকটে গেলে কৃষ্ণকে পাওয়া যাইত, "যাঁহা ধেনু সব করতহি রব" সেই গোষ্ঠের পথে নীপতরুমূলে সখাদের মধ্যে তাহাকে পাওয়া যাইত, দ্বাদশ বনের উপান্তে যমুনাতীরের পুষ্পকুঞ্জে তাঁহার বিলাস হইত, আজ সে দিন ফুরাইয়াছে,

আজ "ব্রজকুল আকুল, দুকুল কলরব,
কানু কানু করি ঝুর।
আজ যশোবতী নন্দ, অন্ধসম বৈঠত,
কোকিলা না করতহি গান।
কুসুম ত্যজিয়া অলি ক্ষিতিতলে লুটই–
তরুগণ মলিন সমান।"

আজ সখাগণ, ধেনুগণ বেণুরব ভুলিতে চলিয়াছে; কারণ তাহাদের অকস্মাৎ বিপদে মূহ্যমান বিমূঢ় চিত্ত হইতে সেই সুখস্বপ্নের স্মৃতিটুকুও মুছিয়া যাইতেছে। আজ,—

"শীতল যমুনা জল, অনল সমান ভেল"

এবং গোপীরা সর্ব্বস্বহারা হইয়া যেথা সেথা পড়িয়া আছে—

"বিপথে পড়ল বৈছে মালতী মালা"

আজ,—

"অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মধুর-বহনা"

তাহাদের স্পর্শ করিয়া প্রদাহের উৎপত্তি করিতেছে। আজ রাধা কৃষ্ণ-রঙ্গ-রস-জনিত নূতন আনন্দ সবে আস্বাদ করিতে যাইতেছিলেন,—প্রতিপদের চাঁদের রেখা যেরূপ বহু আশা দিয়া তিরোহিত হয়, সেইরূপ তাঁহার সমস্ত সুখ সম্ভাবনার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে,—

"প্রতিপদ চাঁদ উদয় যৈছে যামিনী, সুখ নব ভৈগেল নিরাশা"

তখন রাধা বলিতেছেন—

"আমি হরি-লালসে পরাণ ত্যজব, তায়ে পাওব আন জনমে।"

এ জনমে তো পাইলাম না, তাঁকে কামনা করিয়া মরিব, হয়ত অন্য জন্মে তাঁহার সঙ্গে মিলন হইবে।

মাথুরের অনেক গানের উপর পরবর্ত্তী কবিরা তুলি ধরিয়া, রং ফলাইয়া, মাথুর লীলায় অপূর্ব্ব কারুণ্য ঢালিয়া দিয়াছেন। শ্রোতারা মাথুর গানে কাঁদিয়া বিভোর হন; কারণ ভগবানের সঙ্গে বিচ্ছেদ—শিবের সঙ্গে জীবের বিরহ, ইহা হইতে মর্ম্মান্তিক আর কি হইতে পারে? যাঁহাকে খুঁজিতে যাইয়া জন্মে জন্মে কেবলই ভুল করিয়াছি, বিশ্বতরু-ভ্রমে সেওড়া গাছের তলায় নৈবেদ্য সাজাইয়া ভূত-প্রেতের অত্যাচার সহ্য করিয়াছি, কাঞ্চন-ভ্রমে কাচের সন্ধান করিয়া মরিয়াছি, চন্দন-তরু-ভ্রমে কন্টক-লতা আলিঙ্গন করিয়া জর্জ্জরিত হইয়াছি—সেই সার্ব্বকালীন লক্ষ্যের একতম লক্ষ্য, সকল আনন্দের সেরা আনন্দ, সকল আশ্রয়ের শেষ আশ্রয় ভগবানকে পাইয়া, তাঁহাকে হারানো, এ যে কত বড় কষ্ট,তাহা বৈষ্ণব কবিরা অশ্রুর অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছেন।

মাথুরের আর একটি গান, এখানে উদ্ধৃত করিব—

"শীতল তছু অঙ্গ পরশ-রস-লালসে,
করিলু ধরম-গুণ নাশে।
সে যদি মোহে তেজল, কি কাজ ছায় জীবনে
আনহ সখি গরল করু গ্রাসে।
প্রাণাধিকা লো সজনি কাঁহে তোরা রোয়সি,
মরিলে তোরা করবি এক কাজে।
আমায় নীরে নাহি ডারবি, অনলে নাহি দাহবি,
রাখবি তনু এই ব্রজমাঝে।
হামারি দুন বাহু ধরি, সুদৃঢ় করি বাঁধবি,
শ্যাম-রুচি-তরু-তমাল-ডালে।
প্রতি দিবস শর্ব্বরী, অবশি সেথা আসবি,
সময় বুঝি তোরা সকলে মিলে।
(হামারি) ললাট-হৃদি-বাহুমুলে শ্যাম-নাম লিখবি,
তুলসী-দাম দেওবি গলে।
(হামারি) শ্রবণ মূলে শ্যাম নাম কহবি।" ইত্যাদি,

এই সকল গানে সাধারণ নায়ক-নায়িকার রাজ্য ছাড়িয়া প্রেম অধ্যাত্ম জগৎ ছুঁইয়াছে এবং বৈষ্ণবের ঈপ্সিত মৃত্যুর দিকে স্পষ্ট করিয়া ইশারা করিতেছে। ললাট, হৃদি, বাহুমূলে কৃষ্ণ-নামের ছাপ, গলায় তুলসীমালা দেওয়া ও মৃত্যুকালে কৃষ্ণনাম শোনা, ইহা তো মুমূর্ষ বৈষ্ণবেরই শেষ ইচ্ছা। কিন্তু অধ্যাত্মতত্ত্ব এখানে ধর্ম্মের জটিল রূপ ধরিয়া দেখা দেয় নাই, অতি শ্রুতিমধুর মর্ম্মস্পর্শী কবিত্বের অক্ষরে ইহার প্রকাশ। এজন্য একদিকে সাধক, অপর দিকে সাধারণ পাঠক তুল্যরূপে ইহা উপভোগ করিয়া থাকেন। মনোহর-সাই রাগিণীতে এই সকল গীতি যে কিরূপ হৃদয়গ্রাহী হয়, তাহার অভিজ্ঞতা অনেকেরই আছে।

বৈষ্ণব কবিরা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক, তথাপি জনসাধারণই তাঁহাদের লক্ষ্য। খুব উচ্চ স্থান হইতে যেরূপ নিম্ন স্থান দেখা যায়, তাঁহারা সেইরূপ পরমার্থ-প্রেমের উর্দ্ধলোক হইতে জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। এই উদার দৃষ্টির গুণে অজ্ঞ জনসাধারণ তাঁহাদের কাব্যরসের উপভোগ হইতে বঞ্চিত হয় নাই। অথচ ইহা খুব আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যুগযুগান্তর ব্যাপক দর্শন ও অপরাপর শাস্ত্র-চর্চ্চার গুণেই হউক, কিংবা চৈতন্য প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেমোম্মাদনার প্রেরণার দরুণই হউক, অথবা ফকির, দরবেশ, বাউল, সহজিয়া গুরু, কথকঠাকুর প্রভৃতি লোক-শিক্ষকদের সহিত অবিরত সংস্পর্শের ফলেই হউক, বঙ্গের সমস্ত বায়ুস্তরে একটা উচ্চ চিন্তার প্রবাহ বিদ্যমান,—বাঙালার মূর্খ চাষার হৃদয়েও ফল্গু নদীর মত একটা প্রগাঢ় মর্ম্মানুভূতি ও রসধারা খেলা করে, তাহা অপর দেশের শিক্ষিতদের মধ্যেও দুর্ল্লভ। এখানে এই নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে আমরা এক হিসাবে শিক্ষিতই বলিব। তাহারা অনেক সময় নিরক্ষর হইলেও, অশিক্ষিত বলিয়া উপেক্ষিত হইবার যোগ্য নহে। যুগ-যুগের শিক্ষা তাহাদিগকে শিখাইয়াছে—কানুপাদ প্রভৃতি সহজিয়ারা তাহাদিগকে গুহ্য তত্ত্ব শিখাইয়াছেন, বঙ্গের নৈয়ায়িকেরা তাহাদিগকে শিখাইয়েছেন; এমন কি হটযোগী তান্ত্রিকেরা তাহাদিগকে যতটা শিখাইয়াছে, এখনকার উচ্চ-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে তাহা শিখেন নাই।

এই সুচিরাগত সংস্কার ও ভাবপ্রবণতার গুণে বাঙালার জনসাধারণ কীর্ত্তনগুলিকে সমস্ত হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইহা এক অভাবনীয় কাণ্ড। তাহারা গানগুলির মধ্যে সময়ে সময়ে এরূপ সকল ‘আখর’ দিয়া থাকে, যাহাতে সেগুলি অপূর্ব্বভাবে রূপায়িত হইয়া মর্ম্মান্তিক কারুণ্য-পূর্ণ হইয়া উঠে। যেখানে রাধিকা বলিতেছেন (পূর্ব্বোদ্ধৃত গানটি দেখুন) “রাখবি তনু এই ব্রজ মাঝে”, মূর্খ গায়েণ আখর দিয়া গাইল “আমার ব্রজ ছাড়া করিস্ নারে—আমি ব্রজ বড় ভালবাসি, ব্রজে পদরজঃ আছে”—এইরূপ “নীরে নাহি ডারবি” ও “অনলে নাহি দাহবি”, এই দুই পদের পরে আখর দিয়া গায়, “আমায় আর জলে ভাসাস্ না, আমি সদা নয়ন-জলে ভাসি সখি,—আমায় আর পোড়াস্ নাগো সই—আমি বিরহ-আগুনে পোড়া” ইত্যাদি।

যেখানে তমাল-ডালে বাঁধিয়া রাখার কথা আছে, সেখানে গায়েন আখর দিয়া দস্তুর-মত একটি পদ রচনা করিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছে—

"যদি আসিয়া সই, বঁধু শুধায় রাই কই,
তখন তোরা বলিস্ তারে—তোমার বিরহে রাই মরেছে,—
আমরা ফেলি নাই, ওই তমাল-ডালে বাঁধা আছে—
সে যে তোমারে দেখাবার লাগি।
যদি হা-রাধে, হা-রাধে করি', বধুঁ উঠে ফুকরি',
তবে আমার সেই মৃত তনু বঁধুর চরণেতে দিও ডালি।"

রায়-শেখরের পদটির এই ভাষ্য মূর্খ গায়েন করিয়াছে। তাহাকে অবশ্য কবির কাব্যের উৎকৃষ্ট বোদ্ধা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য এই পদ ও আখর কীর্ত্তনিয়ার মুখে না শুনিলে, ইহার সৌন্দর্য্য সমগ্রভাবে ধরা পড়িবে না।

কৃষ্ণ মথুরায় যাইয়া সব ভুলিয়াছেন। কিন্তু গোপীকে যত বড় ঐশ্বর্য্যের কথাই শুনাও না কেন, সে ভুলিবার পাত্র নহে। সে শুধু প্রাণকেই বড় বলিয়া জানে, ধন-মান তাহার কাছে নগণ্য। ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে মাধুর্য্যের প্রভেদ দেখাইবার জন্যই বৈষ্ণব কবির মাথুরের পরিকল্পনা। মথুরাবাসিনীর দর্পের উত্তর গোপী ঝঙ্কার দিয়া বলিতেছে "কিসের বড়াই করিস্ মথুরাবাসিনি! তোদের মণি মুক্ত-জহরৎ— এসকলের মধ্যে ব্রজের একটা ধূলি-রেণুরও দাম নাই।"

এইজন্যই সেই ধূলির জন্য সমস্ত ভারতবর্ষ বৃন্দাবনের দিকে ছুটিয়াছে, তাহারা মথুরার ঐশ্বর্য্য দেখিতে চায় না। এই রেণুর উপর শত শত মঠ, অট্টালিকা —(তাহাদের শীর্ষে সোণার কলস) উঠিয়াছে। আরও কতকাল ধরিয়া উঠিবে কে জানে! সেখানে যে প্রাণ-বঁধুর পদরজঃ আছে, তার চেয়ে মূল্য কাহার বেশী? কৃষ্ণ যখন তাঁহার সপ্ততল মন্দিরের চূড় হইতে গোপীমুখারবিন্দনিঃসৃত "জয় রাধে, শ্রীরাধে" বাণী শুনিলেন, তখন তিনি দ্রুতগতিতে নীচে ছুটিয়া আসিলেন—তাঁহার রাজদণ্ড, রাজপরিচ্ছদ, রাজমুকুট কোথায় পড়িয়া রহিল? তিনি পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন "এ নাম কে শুনালে? মথুরার লোক তো সে নাম জানে না, তাহারা তো যশ-মান-ধনের কাঙ্গাল, তাহারা তো ও নাম জানে না! কে এই উষর মরুভূমির মধ্যে আমার কাণে অমৃত-তুল্য নাম শুনালে?" তখন তাঁহার ধড়া পরিবার অবকাশ হ'ল না, এক পায়ে পায়জামা অপর পায়ে ধড়ার অংশ, এক হাতে রাজদণ্ড, অপর হাত বাঁশী খুজিতেছে। উম্মত্ত বেশে তিনি রাধার কাছে যাইতে ছুটিয়াছেন।

রাধা সখীদের মধ্যে কৃষ্ণ জয়ন্ময় 'রাধা' দেখিতেছেন, রাধাভাবে তিনি উদভ্রান্ত। পুরাণে কথিত আছে, এইরূপ ভাবাবেশে প্রহ্লাদ ব্যাঘ্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি কি আমার পদ্ম-পলাশ-লোচন হরি?" কৃষ্ণ ললিতা সখীকে ধরিয়া উন্মত্ত ভাবে বলিলেন, "কই কই, প্রেমময়ি! পরশিয়ে অঙ্গ শীতল হই—আমি জ্বলে যে আছি, বহুদিন না দেখিয়ে আমি জ্বলে যে আছি"। ললিতা হাসিয়া, সরিয়া গিয়া বলিল, "এ কি কহে বঁধু, তুমি কারে বলি' কারে ধরহে বঁধু! আমি তোমার রাই নই, আমি ললিতা, তোমার প্রেমময়ী রাই দাঁড়িয়ে ওই,—বঁধু, চোখে লেগেছে কি রাই-রূপের ধাঁধা, তাই জগৎ ভরে' দেখছ রাধা-রাধা!" কৃষ্ণ পাগলের মত "কই কই প্রেমময়ী" বলিতে বলিতে পুনরায় সুদেবীকে ধরিলেন, সে হাসিয়া সরিয়া যাইতে যাইতে বলিল, "এ কি করহে বঁধূ, তুমি কারে বলি' কারে ধর হে বঁধু! আমি রাই নই, আমি সুদেবী, তোমার প্রেমময়ী রাই দাঁড়িয়ে ওই—বঁধু সবে ঘোরে তেমার চক্রে, তুমি ঘোর বঁধু রাধা-চক্রে।"

এই সকল ভাব কৃষ্ণকমল মহাপ্রভুর বিভ্রান্ত প্রেমলীলা হইতে সঙ্কলন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত পদে সত্যই কৃষ্ণ জগন্ময় রাধা দেখিয়া ছিলেন—সে কথা ললিতা বলিয়াছিল। সত্যই তিনি উন্মত্তবৎ রাধাচক্রে পড়িয়া দিশেহারা হইয়াছিলেন—সে কথা সুদেবী বলিয়াছিল। তাহারা কৃষ্ণের এই প্রেম-তন্ময়তা বুঝিতে পারিয়াছিল; কিন্তু এখনকার রুচিবিদ্‌গণ এই পদে শ্লীলতার অভাব দেখিয়া লজ্জিত। এইরূপে সম্পূর্ণ বিদেশী ভাবের আয়ত্ত হওয়াতে যাঁহাদের স্বরূপ নিলাম হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা বৈষ্ণবপদতীর্থে প্রবেশের অনধিকারী, "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে, ভাঙ্গে হীরার ধার"।

আমি পূর্ব্বে যে প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছি, এখন পর্য্যন্ত তাহার উত্তর দেওয়া হয় নাই। কৃষ্ণ তো মথুরায় গেলেন, এইখানে কি মাথুর-লীলার পরিসমাপ্তি? তিনি কি সত্যই চিরদিনের জন্য প্রেমের হাঠ ভাঙ্গিয়া গেলেন? আমি বলিয়াছি, বৈষ্ণবেরা কৃষ্ণ-লীলার শেষ স্বীকার করেন নাই। মন্দিরের ভিত্ ধ্বসিয়া পড়িল, বিগ্রহ অপহৃত, সিংহাসন শূন্য হইয়া রহিল। কিন্তু যাহা বাহিরে ছিল, সেই অন্তরের ধনকে ভক্ত অন্তরে কুড়াইয়া পাইল। তাঁহার রূপ তাহারা নয়নে গাথিয়া রাখিল, হৃদয়নাথকে হৃদয়ের অন্তঃপুরে শত দ্বার দিয়া আমন্ত্রণ করিয়া আনিল। তাহারা একথা বলিল না যে, কৃষ্ণ চিরদিনের জন্য বৃন্দাবন ছাড়িয়া গিয়াছেন, বিদ্যাপতির রাধা বলিলেন,

"যব হরি আওব গোকুল-পুর
ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয়-তুর।"

বৃন্দাবনে তিনি ফিরিয়া আসিবেন, রাধা নিজের হৃদয়ে তাহার পূর্ব্বাভাস উপলব্ধি করিয়াছেন। এবার বিজয়-বাজনা (জয়-তুর) বাজাইয়া তাঁহাকে বরণ করিবার সময় হইয়াছে। কিন্তু এবার সমস্ত আয়োজনসম্ভার মানসীপূজার উপকরণ।

"পিয়া যব আয়ব এ মঝু-গেহে,
মঙ্গল আচার করব নিজ দেহে।"

তিনি আসিবেন, কিন্তু বর্হিদ্বার দিয়া আসিবেন না,—এই দেহই শ্রীমন্দির হইবে, "human body is the highest temple of God". মঙ্গলাচরণ সমস্তই দেহে করিতে হইবে। বিদেহী, চিন্ময় কৃষ্ণ হৃদয়ে আসিতেছন,

"বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে।"

আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়া তাঁহার বেদী রচনা করিব এবং আমার আলুলায়িত কুন্তল দিয়া সম্মার্জ্জনী তৈরী করিয়া তাঁহার পথ পরিষ্কার করিব। আর,

"আলিপনা দেয়ব মতিম হার,
মঙ্গল-কলস করব কুচভার।"

আমার কণ্ঠ-বিলম্বিত সুদীর্ঘ মুক্তার হারই আলিপনা-স্বরূপ হইবে, বাহিরের আঙ্গিনায় আলিপনা দেওয়ার প্রয়োজন নাই। বহির্দ্বারে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ মঙ্গল-ঘট স্থাপন করার দরকার নাই, আমার স্তন-যুগ্মই মঙ্গল-ঘট স্বরূপ হইবে।

যাঁহাকে রাধা বাহিরে পাইয়াছিলেন, চক্ষু বুজিলে তো তাঁহাকে দেখা যাইত না, তিনি না আসিলে তো তাঁহাকে পাওয়া যাইত না; সুতরাং একবার মনে হইত, তিনি মুঠার মধ্যে, পুনরায় তাঁহার সঙ্গে বিরহ হইত, পাছে প্রেম ভাঙ্গে, এই ভয়ে মান হইত। কিন্তু আজ যাঁহাকে তিনি পাইলেন, তিনি যেমনই বাহিরে, তেমনই ভিতরে; তাঁহাকে চক্ষু মেলিয়া বিশ্বে স্বপ্রকাশরূপে দেখা যায় এবং চক্ষু বুজিয়া ধ্যান-ধারণার মধ্যেও তেমন পাওয়া যায়। আজ খণ্ডিতা-বিপ্রলব্ধা ও কলহান্তরিতার পালা শেষ, আজ মাথুরের মর্ম্মান্তিক কষ্ট আর নাই। এই ভাঙ্গা-

গড়ার অতীত, সর্ব্বপ্রকার চাঞ্চল্যমুক্ত পূর্ণানন্দস্বরূপকে তিনি অখণ্ডভাবে পাইলেন, তাই বিদ্যাপতির রাধা হর্ষোচ্ছ্বাসে গাহিলেন,

"আজ রজনী হাম ভাগে পোহাইনু,
পেখুন পিয়া-মুখ-চন্দ—"
"আজ মঝু দেহ, দেহ করি মানিনু,
আজ মন্তু দেহ ভেল দেহ।"

আজ সমস্ত সন্দেহ দূর হইল, মান-অভিমানের পালার উপর যবনিকাপাত, আজ নির্দ্বন্দ্বভাবে তাঁহাকে পাইয়াছি,

"আজ বিহি মোহে, অনুকূল হোয়ল টুটল সবহি সন্দেহ"

সুতরাং

"সোহি কোকিল অব লাখ ডাকয়ু, লাখ উদর করু চন্দ,
পাঁচ বাণ অব লাখবান হউ, মলয় পবন বহু মন্দ।"

তখন একটা কোকিল ডাকিলে রাধিকা অস্থির হইয়া পড়িতেন, আজ এই শুভ মিলনরাত্রে লাখ বার কোকিল ডাকুক; পূর্ব্বে কামদেবের একটি সায়ক, আকাশে একটি চন্দ্রের আবির্ভাব হইলে "তব কুসুম শরত্বং শীতরশ্মিত্বমিন্দোঃ" রাধার পক্ষে অযথার্থ হইত, ইন্দুময়ুখে অগ্নির জ্বালা উৎপন্ন করিত, পঞ্চবাণ বজ্রসারের মত ঠেকিত, আজ পাঁচবাণ স্থলে লক্ষবাণ পড়ুক, এক চন্দ্রের স্থলে লক্ষ চন্দ্র উদিত হউক, আজ যে শুভ মিলন-রাত্রি। কিছু পূর্ব্বে চণ্ডীদাস এইরূপ উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন,

"এখন গগনে উদয় করুক চন্দ,
মলয় পবন বহুক মন্দ,
কোকিলা আসিয়া করুক গান,
ভ্রমরা ধরুক মধুর তান।"

চণ্ডীদারে এই সরল সুন্দর পদটি লইয়া বিদ্যাপতি তার উপর রং ফলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

রাধার অবস্থা কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি লিখিয়াছেন, "নয়নক সিঁদ গেও, বয়ানক হাস"—"ধরণী ধরিয়া ধনী কত বেরি বৈঠত, পুনতহি উঠই না পারা। কাতর দিঠি করি, চৌদিশ হেরি হেরি, নয়নে গলতি জল ধারা"—এই আসন্ন-মৃত্যু রাধা বিরহের নানা চক্রে, নানা দশায় পড়িয়া 'আধতনু কালিন্দী-নীরে,' অবস্থায় পৌছিয়াছিলেন–এইখানেই মাথুর ভাবের শেষ; কিন্তু বিরহে পুড়িয়া যে ছাই রহিল, গল্প-কথিত ফিনিক্সের মত তাহা হইতে রাধার হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেম নূতন অবয়ব ধরিয়া জন্ম পাইল। বাহিরে হারাইয়া তিনি তাহাকে মনের মধ্যে পাইলেন—ইহাই "ভাব-সম্মেলন"—বঙ্গীয় প্রেম-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ কথা—নূতন আবিষ্কার।

কৃষ্ণ এইরূপে নূতনভাবে তাহার মনের বৃন্দাবনে আসিবেন, সেখানকার রাধাকুণ্ড, কামকুণ্ড, দ্বাদশবন ও শ্যামকুণ্ড, সকলই মনের, সে বৃন্দাবনের নাম নিত্য বৃন্দাবন—সেখানে কিছু হারায় না, তাহা পাওয়ার দেশ। সখীরা বিলাপ করিতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ রাধা মনে পুলক অনুভব করিলেন, হঠাৎ দূরাগত বংশী-রবের মত কে যেন মনের কাণে কাণে একটা শুভ সংবাদ দিয়া গেল। সে সংবাদ-বাহককে রাধা চিনেন না, তথাপি তাহা বিশ্বাস করিলেন। রাধা সখীদেরে ডাকিয়া বলিলেন,

"আজ কুদিন সুদিন ভেল,
আজ মাধব মন্দিরে আওব তুরিতে, কপাল কহিয়া গেল।"

রাধার চিত্ত হর্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—কৃষ্ণ আসিবেন, কে বলিল! রাধা বলিলেন "কপাল কহিয়া গেল"—আমার কপাল, আমার ভাগ্যলক্ষ্মী বলিয়া গেলেন। আমি অভ্রান্ত ভাবে আমার সে সৌভাগ্য বুঝিয়াছি। বহুদিন পরে

"আমার চিকুর ফুরিছে, বসন খসিছে, পুলক যৌবন-ভার।
বাম অঙ্গ আঁখি, সঘনে নাচিছে, দুলিছে হিয়ার হার।"

কোন দূত বা সংবাদবাহক বলিয়া যায় নাই; বাঁশী আমাকে 'রাধা' বলিয়া ডাকে নাই, এই কথা কোন বাহিরের সূত্র হইতে পাই নাই, আমি তাঁহার পদের নূপুর-সিঞ্জনের মধুর শব্দ শুনি নাই—কিন্তু তথাপি বুঝিয়াছি তিনি আসিতেছেন;

নতুবা আমার বেণী-মুক্ত কুন্তল হঠাৎ মহাহ্লাদের সাড়া দিয়া উঠিবে কেন? আমার সুখ-রোমাঞ্চিত দেহ হইতে অঞ্চল বারংবার স্খলিত হইয়া পড়িতেছে কেন? আমার বিরহ-খিন্ন উপবাস ও জাগরণ-ক্লিষ্ট শরীর নব যৌবনের পুলকে অধীর হইয়া উঠিবে কেন? বাম অঙ্গ ও আঁখির নর্ত্তনেও সেই কথা বুঝাইতেছে। আজ সেই আনন্দের ঢেউ লাগিয়া হৃদয়ের স্পন্দনের সহিত বক্ষবিলম্বিত মুক্তাহার দুলিয়া উঠিতেছে।

নিত্যই তো প্রাতঃকালে গাছে গাছে কাকগণ কোলাহল করিয়া আহার বাঁটিয়া খায়; বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন "কান্ত কাক-মুখে নাহি সংবাদই।" পুরাকালে দূরগত স্বামীর বিরহে কাতরা রমণীরা হাত জোড় করিয়া কাকের কাছে শত শত বার স্বামীর শুভাশুভ-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন। কাকের কি রবের কি অর্থ, তাহা কাক-চরিত্রে লিখিত আছে। রাধাও প্রতিদিন কত কি জিজ্ঞাসা করিতেন। কিন্তু আজ "পিয়া আসিবার নাম শুনাইতে, উড়িয়া বসিল তায়" কাক শুভস্বর করিয়া আমার নিকটে উড়িয়া আসিল।

আজ "মুখের তাম্বুল খসিয়া পড়িছে, দেবের মাথার ফুল"—অহেতুক আনন্দে কার সোহাগে মুখের চর্ব্বিত তাম্বুল খসিয়া পড়িয়াছে? শিবমন্দিরে প্রণাম করিতে যাইয়া, হঠাৎ শিবের মাথার আশীর্ব্বাদী ফুল আমার হাতে আসিয়া পড়িল।

এই সুলক্ষণগুলি বহুদিনের অনাস্বাদিত-সুখের, অপূর্ব্ব-প্রাপ্তির আনন্দের নিশ্চিত সূচক। রাধার অন্তরের দেবতা তাঁহাকে এইভাবে সে সুখ সংবাদ দিলেন, কৃষ্ণ সত্যই আসিবেন।

কত বার তিনি তমাল-তরুকে কৃষ্ণ-ভ্রমে শিহরিত রোমাঞ্চিত দেহে দাঁড়াইয়া সখীকে বলিয়াছিলেন,

"আমার কেন অঙ্গ হৈল ভারি।
আমি যে আর চল্‌তে নারি।"

রাধাকে আশ্বাস দিতে যাইয়া সখীরা বলিয়াছেন, কৃষ্ণ সত্যই আসিয়াছেন। সে ভ্রম ঘুচিলে, রাধা "পেয়ে নিধি হারাইলাম" বলিয়া কাঁদিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, "তোরা তো ঠিকই বলেছিলি কৃষ্ণ এসেছিলেন, কিন্তু "আমার ভাগ্যে তমাল হ'ল।" কত দিন মেঘকে কৃষ্ণ ভ্রম করিয়া অহেতুক পুলকে তিনি হৃষ্টা হইয়াছেন, কত প্রলাপোক্তি করিয়াছেন, আজ কৃষ্ণকে দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। কি জানি, আবার যদি তমাল বা মেঘ হইয়া যান!

উৎকট কুণ্ঠার সহিত দ্বিধাযুক্ত ভাবে রাধা সখীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কত বার তো তিনি ছলনা করিয়া নব মেঘ হইয়া গিয়াছেন—

কুঞ্জের দ্বারে ঐ কে দাঁড়ায়ে!
দেখ দেখ গো ও বিশাখে,

ওকি বারিধর কি গিরিধর, ওকি
নবীরন মেঘের উদয় হ'ল।
নাকি মদন মোহন ঘরে এল!
ওকি ইন্দ্রধনু যায় দেখা—নব জলদের মাঝে,
নাকি চুড়ার উপর ময়ূর পাখা!
"ও কি বক শ্রেণী যায় চলে, নাকি মুক্তমালা দোলে গলে!
ওকি সৌদামিনী মেঘের গায়, নাকি পীত বসন দেখা যায়!
ওকি মেঘের গর্জ্জন শুনি, নাকি প্রাণনাথের বংশীধ্বনি।"

আকাশে উড্ডীন বলাকা-পংক্তি দেখিয়া তিনি কত বার ভুল করিয়াছেন, উহা তাঁহার প্রাণনাথের গলার মুক্তামালা; মেঘের অঙ্গে স্ফূরিত বিদ্যুদ্দাম দেখিয়া মনে করিয়াছেন, উহা তাঁহার বঁধুর অঙ্গের পীতবসন। "সখীরা আজ তোরা ভাল করিয়া দেখিয়া আয়,—সত্যই কি তিনি আসিয়াছেন?"

ভাব-প্রবণতার প্রবল উচ্ছ্বাসে কাব্য উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়, কবি উন্মত্ততার সম্মুখীন হন। রাধা আজ আনন্দ ও নিরানন্দের দ্বন্দ্বে সেই সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছেন, এই ভ্রান্তি মধুর ও কবিত্ব পূর্ণ।

কৃষ্ণকমল এই যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা তাঁহার শুধু কল্পনা-জাত নহে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই ভ্রান্তির সমস্তই বাস্তব হইতে পাওয়া। চৈতন্য "বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল"'—("তমালের বৃক্ষ এক নিকটে দেখিয়া, কৃষ্ণ বলি' তারে যেয়ে ধরে জড়াইয়া")—এবং মেঘকে কৃষ্ণভ্রমে যে সকল কাতরোক্তি করিয়াছেন, তাহা চৈতন্যচরিতামৃতাদি পুস্তকে পাওয়া যায়। সেই চৈতন্যচরিতামৃতের শেষ অঙ্কের পাগল গোরাকে কৃষ্ণকমল এইভাবে কাব্যপটে ধরিয়া রাখিয়াছেন; এই চিত্র স্বপ্ন ও জাগরণের সন্ধিস্থলে; যাঁহারা ইহার আভাষ পাইয়াছেন, তাঁহারা সেই স্বপ্নই চাহিবেন, জাগরণ চাহিবেন না।

সমস্ত সন্দেহের নিরসন হইয়াছে, কৃষ্ণ সত্যই আসিয়াছেন, তখন রাধা বলিতেছেন:—

"বহুদিন পরে বঁধুয়া আইলে।   দেখা না হইত মরণ হ'লে।"

চণ্ডীদাসের এই পদ বুঝাইতে যাইয়া কৃষ্ণকমল বলিয়াছেন:—

"একবার আসিয়া সমক্ষে, দেখিলে স্বচক্ষে,
(জান্‌তে) কত দুঃখে রক্ষে করেছি জীবন।
ভাল ভাল বঁধু, ভাল তে আছিলে,
ভাল সময় এসে ভালই দেখা দিলে—
আর ক্ষণেক পরে এলে,—দেখা হ'ত না,
তোমার বিরহে সবার হ'ত যে মরণ।"

চণ্ডীদাসের রাধা বলিতেছেন:—

"দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল,
তুমি তো মথুরায় ছিলে হে ভাল।
আমার এতেক সহিল অবলা ব'লে,
ফাটিয়া যাইত পাষাণ হ'লে।"

কোমল জিনিষ অনেক সহিতে পারে, আঘাতে ভাঙ্গে না, যেমন কাদা। যে প্রতিরোধ করিতে চায়, সে না পারিলে ভাঙ্গিয়া যায়, যেরূপ পাষাণ। আমি অবলা বলিয়াই, এত দুঃখ সহিয়া বাঁচিয়া আছি।

"সে সকল কথা রহুক দূরে,
আজ মদনমোহনে পেয়েছি ঘরে।"

যত দুঃখ পাইয়াছি, তাহা বলিবার দরকার নাই; বলিতে গেলে আনন্দের দিনে, উৎসবের গৃহে বঁধুর নিষ্ঠুরতার কথা ইঙ্গিতে আসিবে—এজন্য রাধা বলিতেছেন, সে প্রসঙ্গ এখন থাকুক। "দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল, মথুরা নগরে ছিলে তো ভাল।"

যিনি চক্ষুর পলকে আমায় হারাইতেন, তিনি এই যুগ-যুগ-ব্যাপী কাল আমাকে কিরূপে ভুলিয়া রহিলেন? তাঁহার ভালবাসা যেমন অসীম, নিষ্ঠুরতাও তেমনই অসীম। আজ আনন্দের দিনে সেই কথার উল্লেখের অবকাশ নাই। যেটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহার তিলমাত্র রসবিঘ্নকর কথার এখন অবকাশ নাই।

"নেত্রপলকে যে নিন্দে বিধাতাকে,
এত ব্যাজে দেখা সাজে কি তাহাকে?
যাহৌক দেখা হ'ল, দুঃখ দূরে গেল,
এখন গত কথার আর নাই প্রয়োজন।"

এই 'ভাব-সম্মেলনে' কৃষ্ণের নিকট রাধা সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। হৃদয়ের অর্গল বন্ধ করিয়া, তিনি মনোমন্দিরে একান্তে তাঁহাকে পাইয়া, যে-সকল মধুর কথা তাঁহাকে বলিয়াছেন, তাহা বৈদিক যাজ্ঞিকের হোমকুণ্ডের পার্শ্বে উচ্চারিত উপনিষদের মন্ত্র। "বধূ, তুমি আমার প্রাণ-স্বরূপ। আমি শুধু দেহ-মন নহি, আমার সমস্ত কুলশীল, অভিমান ও সংস্কার আজ তোমাকে সঁপিয়া দিলাম। তুমি অখিল ব্রাহ্মাণ্ডের অধিপতি, তা' কি আমি জানি না। আমি তুচ্ছ গয়লার মেয়ে—"আহিয়িনী, কুরূপিণী, গ্রাম্য গোপবালিকা।" এই ইন্দ্রিয়-রূপ পশুগুলিকে পরিচর্য্যা করাই আমার কাজ, "আমরা সকলেই পশুপালিকা" "আমরা কৃষ্ণসেবার কিবা জানি?" তুমি যোগী ঋষির আরাধ্য—"যোগীজনাঃ জানন্তি", আমি ভজন পূজনের কিবা জানি? কিন্তু আমার দেহ-মন সমস্তই তোমার প্রেম গঙ্গায় ভাসাইয়া দিয়াছি। তোমার পদচ্যুতা গঙ্গার ধারাটি শ্মশান সমান উষর মরুভূমিতে পথ হারাইয়া তোমার পদাশ্রয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে। পড়শীরা আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে ঘৃণা করে। তারা আমাকে 'কলঙ্কিনী' বলিয়া ডাকে। কিন্তু তাহাতে আমার দুঃখ নাই। তোমার নামের সঙ্গে আমার কলঙ্ক-কথার যোগে আমি গৌরব অনুভব করি। আমি সতী হই বা অসতী হই, তুমিই জান, আমি লোক-চর্চ্চা গ্রাহ্য করি না। আমি কি মন্দ, কি ভাল তাহা জানি না; আমার পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই তোমার যুগল পাদপদ্ম।" পরমহংস দেবও ইহার উপরে কিছু বলেন নাই:—

বঁধু, তুমি সে আমার প্রাণ,

দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি, জাতি-কুল-শীল-মান,
অখিলের নাথ, তুমি হে কালিয়া, যোগীর আরাধ্য ধন,
গোপ-গোয়ালিনী, হাম অতি দীনা, না জানি ভজন-পূজন।
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে, তাহাতে নাহিক দুখ,
বঁধু, তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।
পীরিতি রসেতে ঢালি' তনু মন, দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর গতি, তুমি মোর পতি, মন নাহি আন ভায়।

সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত, ভাল মন্দ নাহি জানি,
কহে চণ্ডীদাস পাপপুণ্য মম তোমার চরণ মানি।"

নিরিবিলি কৃষ্ণকে পাইয়া তিনি কত কথাই না বলিতেছেন,—তাহার প্রতিটি শব্দ , জীবনের অনন্ত দুঃখ, সখা-সঙ্গের অনন্ত আনন্দ কত মধুরাক্ষরা কথায়, কত মর্ম্মান্তিক কারুণ্যপূর্ণ অশ্রুধারায় ব্যক্ত হইতেছে। তিনি বলিতেছেন: "বঁধু, তোমায় আমি আর কি বলিব, তোমাকে আজ যেমন করিয়া পাইয়াছি, সেই প্রাণপতিরূপে যেন তোমার এই মহা অবদান—এই মানবজন্ম ফুরাইয়া না যায়। জীবনের প্রতি অঙ্কে, রস-রূপে, আনন্দময়-রূপে, বিধানকর্ত্তা-রূপে, স্নেহে-প্রেমে-সখ্যে—রক্ষক-রূপে—পালক-রূপে যেন সর্ব্বদা তোমাকে পাই, জীবনের সঙ্গি-স্বরূপ যেন তুমি প্রতি মুহূর্ত্ত আমার কাছে থে'ক এবং মৃত্যুকালে যেন তোমার মূর্ত্তি আমার ঊর্দ্ধগত নেত্র কণীনিকায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। জীবনে-মরণে তুমি আমার হইয়া আমার কাছে থে'ক। শুধু জীবনে-মরণে নহে, "জনমে-জনমে প্রাণনাথ হৈও তুমি।" তোমার সঙ্গে তো আমার এক জন্মের সম্বন্ধ নহে—এ সম্বন্ধ জন্ম জন্মের—কোন জন্মে যেন তোমার কাছ হইতে সংসার আমাকে ভুলাইয়া না লইয়া যায়। এই মরীচিকা-সঙ্কুল, প্রতারণার রাজ্যে অনেকেই আমাকে পথ ভুলাইতে আসিবে—রূপ, যশঃ, মান, ঐশ্বর্য্য তুমি ঘাটে ঘাটে রাখিয়াছ— আমার মনের বল ও অনুরাগ পরীক্ষা করিতে। কোন অশুভ মুহূর্ত্তে যেন তাহারা তোমাকে আড়াল করিয়া না দাঁড়ায়। রাধিকা বলিতেছেন—"হে জীবনধন, তুমি জীবনে আমার হইও, মরণে আমার হইও—জন্মে জন্মে আমার হইও। তোমার চরণ-পদ্মের সঙ্গে আমার প্রাণের একটা ফাঁসি লাগিয়া গিয়াছে,—যদি মুহূর্ত্তের জন্য চরণ সরাইয়া লইয়া যাও, তবে সেই প্রেমের ফাঁসীতে আমার প্রাণ যাইবে। তাই আমার সমস্ত তোমাকে নিবেদন করিয়া, এমন হইয়া আমি তোমার চরণের দাসী হইয়াছি। আমার একুলে—স্বামীর কুলে, ওকুলে পিতৃকুলে বৃষভানুর পুরীতে, দুকুলে—বৃন্দাবনে অবস্থিত এই দুকুলে আমার আর কে আছে? বিপথে গেলে কে আমায় উদ্ধার করিবে? বরং মায়ায় আবদ্ধ করিয়া তাহারা তোমার কাছ হইতে আমাকে দূরে লইয়া যায়। এই বিভ্রান্ত মায়াপুরী হইতে আমাকে কে রক্ষা করিবে?

"বঁধু! কি আর বলিব আমি
আমার জীবনে-মরণে মরণে-জীবনে প্রাণনাথ হৈও তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে বাধিল প্রেমের ফাঁসি,
সব সমর্পিয়া, একমন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী।
আমার একুলে, ওকুলে, দু'কুলে গোকুলে, আর মোর কেবা আছে।
রাধা বলি কেহ শুধাইতে নাই, জানাব কাহার কাছে।"

এই ভাবে রাধা একেবারে নিঃস্ব ও নিরাশ্রয় হইয়া তাঁহার আশ্রয় লইয়াছেন। যে আশ্রয়ের পূর্ব্বসংস্কার তাঁহার ছিল, তাঁহার স্বামিকুল, পিতৃকুল—তাহা অস্বীকার করিয়া তিনি তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। নিরাশ্রম নিরবলম্ব হইয়া, তিনি একমাত্র ভগবানকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন।

এ যেন পুষ্পতরু, মাটীকেই একমাত্র আশ্রয় মনে করিয়া, বহু শিকড় দ্বারা তাহাকে আকঁড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহার উর্দ্ধে নীলাকাশ, শত শত পাখী কলবর করিয়া তথায় উড়িয়া যাইতেছে, কিন্তু তরু উড়িতে চাহিয়া জল ভিক্ষা করে না, তাহার দশদিকে কত পশু, জীব, মানব নান কাম্যবস্তুর লোভে ছুটাছুটি করিতেছে, —সেই দশ দিকের দশপথ সে দেখে না। সে যাহা আরাধনা করে, তাহা সমস্তই মাতৃক্রোড়ে বসিয়া, মাতার নিকট। এইভাবে সকল দিক্ হইতে মন সরাইয়া আনিয়া তাঁহাকে সমর্পণ করিলে এবং যোগীর মত আত্মস্থ, ধ্যানস্থ হইয়া তপস্য করিতে পারিলে, সর্ব্বসিদ্ধি-লাভ হয়। কাম্যের অধিক ফল অযাচিতভাবে আসিয়া হাতে পড়ে। যে মাটীর আপাত দৃষ্টিতে কোন বর্ণসম্পদই নাই—যাহা ঘ্রাণহীন ও নীরস, সেই মাটী হইতে বর্ণের সম্রাজ্ঞী পদ্মিনী ফুটিয়া উঠে কিরূপে? কোথা হইতে গোলাপ, মল্লিকা, বেলা, কুন্দ এত শোভা এত গন্ধ পায়? কোথা হইতে ফজলী ও নেংড়া আমের গাছ এবং খর্জ্জর তরু ও ইক্ষুলতা অফুরন্ত অমৃতরসে সমৃদ্ধ হয়? কোথা হইতে চন্দন তাহার সুবাস সংগ্রহ করে?—এই আত্মস্থ তপস্যার বলে। উহারা সংসারের নানাদিকের নানা প্রলোবনে আকৃষ্ট হয় নাই; উহারা বুঝিয়াছে জীব-মানবের গতিশীলতা ভুল পথে লইয়া যায়। তাহারা বুঝিয়াছে, যিনি চারিদিকে এত সম্পদের সৃষ্টি করিয়া বিশ্ব-চরাচরে ঝলমল করিয়া প্রকাশ পাইয়াছেন, তিনি এই মূহূর্ত্তে এইখানেই আছেন। যিনি জীবের নিকট হইতেও নিকট, তাঁহাকে খুঁজিতে অন্যত্র যাইয়া লাভ নাই—বরং তাহাতে লোকসান আছে। বাহিরের ছবি ছায়াবাজির মত, তাহারা খাঁটী জিনিস দেখায় না। এইজন্য তরু যেখানে জন্মিয়াছে, সেইখানেই আসন পাতিয়া বসিয়া তপস্যা করিতেছে। সে বুঝিয়াছে, বাড়ী-ঘর নিরাপদ্ নহে, উহা মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে, বজ্রপাতে ছাদ ভাঙ্গিয়া যায়। গৃহের মধ্যেও সর্পে দংশন করে, আবৃত স্থানে থাকিলেও পীড়া হয়—ইহা সংস্কার ও অভ্যাস মাত্র, বরং পশু-পক্ষীর জীবনই স্বাভাবিক জীবন। ভগবানের চরণপদ্ম ছাড়া আর কোন আশ্রয়ই আশ্রয় নহে। এজন্য তরু আশ্রয়ের জন্য চতুর্দ্দিকে ধাবমান হয় না, সে শুধু লতার মত তাঁহাকেই জড়াইয়া থাকিতে চায়; ভগবানের চরণপদ্মই তাহার সর্ব্ব আশ্রয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। আকাশ যখন ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়, বিদ্যুৎস্ফূরণে দিক্ প্রকম্পিত হয়, ভীষণ অজগর যখন ফোঁস-ফোঁস করিতে করিতে নেত্রে অগ্নিবর্ষণ করিয়া ছুটিয়া আসে, তখন হয়ত সে তাঁহার কৃপালাভ করিতে পারিলে নিরাপদে থাকে, ঘন-বর্ষণে তাহার পত্র-পল্লব আরও সবুজ হয়, তাহার শিব-তুল্য দেহ জড়াইয়া ধরিয়া সর্প নিজের বিষের

জ্বালা তুলিয়া যায়—কারণ সে অমৃতময়কে আশ্রয় করিয়া অমৃতময় হইয়া উঠিয়াছে।

বৈষ্ণবের জ্ঞানকর্ম্ম ছাড়িয়া এজন্যই তাঁহাকে আশ্রয় করাই প্রেমিকের শেষ লক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন এবং গীতা বলিয়াছেন "সর্ব্বসর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

চণ্ডীদাসের রাধা এইভাবে সমস্ত আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছেন। একুল-ওকুল, এই দুই কুল ত্যাগ করিয়া তিনি একেবারে কৃষ্ণপ্রেমের মাঝ-দরিয়ায় ঝাঁপ দিয়াছেন। তিনি ধনিশ্রেষ্ঠ আয়াণ ঘোষের অট্টালিকা ও বৃষভানুর প্রাসাদ ছাড়িয়া দিয়া, বসনভূষণ পরিত্যাগপূর্ব্বক একেবারে রিক্তা হইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন—তখন কানু-অনুরাগই তাঁহার একমাত্র রাজাবাস, কানুর কলঙ্কই এই দিগম্বরী সন্ন্যাসিনীর অঙ্গভষ্ম, কানুর নাম শ্রবণই তাঁহার শ্রুতির মহার্ঘ অলঙ্কার—যোগিনীর কুণ্ডল; ভিতরে ও বাহিরে তিনি সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণের হইয়া বলিতেছেন:—

"সবে বলে মোরে শ্যাম-সোহাগিনী, গৌরবে ভরল দে।
হামারি গরব তুহুঁ বাড়ায়লি, অব টুটায়ব কে?"

আর একটি পদে গৃহে থাকাকালীন তিনি যে কষ্ট পাইয়াছেন—তাহার ইতিহাস দিতেছেন—হে কৃষ্ণ, আমি স্ত্রীলোক, কি করিয়া তোমায় মনের দুঃখ বুঝাইব? আমার পা আছে, কিন্তু চলিবার সাধ্য নাই, কোন ছলে তোমার শ্রীমন্দিরের দিকে পা বাড়াইলে লোকে টিট্‌কারী দেয়; আমার মুখ আছে, কিন্তু কিছু বলিবার সাধ্য নাই, এজন্যই লোকে স্ত্রীলোককে "অবোলা" বলে। এক স্থানে চণ্ডীদাস রাধিকার মুখে বলিয়াছেন—চোরের মা যেমন ফুকারিয়া কাঁদিতে পারে না, তাঁহার সেই অবস্থা। আমার চোখ আছে, কিন্তু নয়নাভিরাম মূর্ত্তি আমার দেখিবার সাধ্য নাই। ("নিশ্বাস ফেলিতে না দেয় ঘরে ননদিনী") চোখ মেলিলে বলে—'কি দেখ্‌ছ'; চোখের জল ফেলিলে বলে—'কেন কাঁদ্‌ছ'। বঁধু, স্ত্রীলোকের মনের দুঃখ মনেই থাকে।

"শুনহে চিকন কালা,
বলিব কি আর, চরণে তোমার,
অবলার যত জ্বালা!,
চরণ থাকিতে না পারি চলিতে
সদা যে পরের বশ,

কোন ছলবলে তব কাছে এলে
লোকে করে অপযশ!
বদন থাকিতে না পারি বলিতে
তেঁই সে ‘অবোলা’ নাম,
নয়ন থাকিতে সদা দরশন
না পেলেম নবীন শ্যম।
অবলার যত দুঃখ প্রাণনাথ,
সব থাকে মনে মনে।”

চণ্ডীদাস কাব্যলোকের ঊর্দ্ধে—সরস্বতীর এলাকা ছাড়িয়া তিনি সরস্বতীনাথের রাজ্যে গিয়াছেন। এজন্য উপমা ও উৎপ্রেক্ষায় যেরূপ বিদ্যাপতির পদ ঝলমল, সে তুলনায় ইঁহার কবিতা কতকটা নিরাভরণ—তাহার যোগিনীর বেশ; কিন্তু মর্ম্মের মর্ম্মকথা তিনি যেরূপ আবেগে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সর্ব্বত্যাগী আত্মবিস্মৃত প্রেমের মূর্ত্তি মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এক-একটি পদ হৃদয়ে ঘা দিয়া মর্ম্মের কথা টানিয়া বাহির করে। পরবর্ত্তী কবিরা তাঁহার পদগুলির মধ্যে আখর-যোজনা করিয়া সেগুলি সমৃদ্ধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহার পদে সেরূপ আখর-যোজনার অজস্র অবকাশ আছে। ধরুন বর্ষা-রজনীর একটি বিরহের পদ—ইহা স্বপ্নাধ্যায়-ভুক্ত।

“আমি পরাণনাথেরে স্বপনে দেখিলাম
সে যে বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া
ঈষৎ মধুর হাসে।
আমার মরমে পশিল লেহ, হৃদয়ে লাগিল দেহ,
শ্রবণে ভরল সেই বাণী,
দেখিয়ে তাহার রীত, যে করে আমার চিত,
আমি কি করিব কুলের কামিনী!
(তাহে) অঙ্গ পরিমল, সুগন্ধি চন্দন,
কুঙ্কুম-কস্তুরী পারা।
পরশ করিতে রস উপজিল,
জাগিয়া হইনু হারা।
(তখন) চাতক পাখীরে চকিতে বাটুল
মারিলে যেমত হয়,
স্বপন ভাঙ্গিয়া তেমতি হইল,
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়।”

এই গানটি গভীর অনুভূতি ও প্রিয়সঙ্গের আবেশে পূর্ণ, স্বপ্নে রাজ্য-প্রাপ্তির মত। যাহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছি, সেই তপস্যার ধনকে যে-স্বপ্নে পাওয়া গিয়াছে, সে স্বপ্নটিও কি অভূতপূর্ব্ব সুখদায়ক। তিনি আসিয়া শিয়রে বসিলেন এবং হাসিয়া বেশর স্পর্শ করিলেন, তাঁহার স্পর্শে হৃদয়ে স্নেহের বান ডাকিয়া উঠিল; রাধার কর্ণে তাঁহার বাণী বাজিয়া উঠিল এবং তিনি তাঁহার বক্ষে কৃষ্ণদেহের স্পর্শ অনুভব করিলেন, তাঁহার আদরে মন যেরূপ করিতে লাগিল, তিনি কুলকামিনী হইয়া তাহা মুখ ফুটিয়া কিরূপে প্রকাশ করিবেন? তাঁহার অঙ্গ-গন্ধ চন্দন-কস্তুরী-তুল্য; সেই গন্ধ রাধাকে পাগল করিয়া ফেলিল—কিন্তু রসাবেশের এই পূর্ণ মুহূর্ত্তে সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চাতক-পাখী ইন্দ্রদত্ত মেঘের একবিন্দু বারি পাইবার আশায় তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠে ধাবিত হইতেছিল, এই সময়ে কে তাহার বুকে বাটুল মারিয়া তাহাকে মাটীতে ফেলিয়া দিল! স্বপ্ন-ভঙ্গে রাধার সেই বাটুলাহত চাতকের দশা।

এই চিত্রে স্বপ্নে-পাওয়া কৃষ্ণসঙ্গের সুখোপলব্ধির প্রগাঢ়ত্ব ও তাঁহাকে হারাইবার মর্ম্মন্তুদ ক্ষোভ প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই কবিতাটির রসাস্বাদ করিতে করিতে চণ্ডীদাসের সম্মোহন সুরে জ্ঞানদাসের হৃদ্‌তন্ত্রী বাজিয়া উঠিয়াছিল। তিনি পদটি বাড়াইয়া নিজের ভণিতা দিয়া চালাইয়াছেন—চোরের মত নহে, শিষ্যের মত, আখরিয়ার মত, টীকাকারের মত—তাহাতে পদটির ভাবের মর্য্যাদা একটুকুও খর্ব্ব হয় নাই, কিন্তু কবিত্বের সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে। এই কবিত্ব চণ্ডীদাসের পদ তাঁহার মনে জাগাইয়া তুলিয়াছিল, উহা তিনি অপর কোন স্থান হইতে কুড়াইয়া পান নাই। এ যেমন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত। চণ্ডীদাসের ভাবধারা অনুসরণ করিয়া, সেই ধারায় উদ্ভূত হৃদয়োচ্ছ্বাস দিয়া তিনি চণ্ডীদাসের কবিতাটি সাজাইয়াছেন।

আমি তৎকৃত যোজনাসহ কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমি পরাণনাথেরে স্বপনে দেখিলাম, সে যে বসিয়া শিয়র পাশে,
নাসার বেশর পরশ করিয়া ঈষৎ মধুর হাসে।

কিবা রজনী শাওণ, ঘন দেয়া গরজন,
রিমি ঝিমি শবদে বরিবে,
পালঙ্কশয়ন রঙ্গে, বিগলিত চীর অঙ্গে,
আমি নিঁদ যাই মনের হরিষে।
শিখরে শিখণ্ডী রোল, মত্ত দাদুরী বোল,
কোকিলা ডাকিছে কুতূহলে,

ঝিঁ ঝিঁ ঝিমকি ঝাঁজে, ডাহকী সে গরজে,
আমি স্বপন দেখিলাম হেন কালে।

আখরিয়া কৃষ্ণের হাসিটির ব্যাখ্যা করিয়া বলিবে—সে হাসি ছুরির মত, হৃদয় কাটিয়া যায়; মিষ্টত্বের এই তীক্ষ্ম আঘাত যিনি বুঝিয়াছেন, তিনিই এই কথার অর্থ বুঝিবেন। কোন সময়ে হাসি যে ধারাল ছুরির মত হৃদয় কাটিয়া যায়, তাহা কেহ কেহ হয়ত অনুভব করিয়া থাকিবেন।

পরবর্ত্তী অংশে জ্ঞানদাস যে কয়েকটি ছত্র (কিবা রজনী শাওণ… আমি স্বপন দেখিলাম হেন কালে) যোগ করিয়াছেন, তাহাতে মনের অবস্থার উপর রং ফলাইয়া তিনি বর্ষারাত্রের এই মিলনের রস প্রগাঢ় করিয়াছেন।

যদিও কোন কোন সংগ্রহ-পুস্তকে সমস্ত পদটিই চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়, এই প্রকৃতি-বর্ণনার সুরটি কখনই চণ্ডীদাসের নহে, ইহা শব্দ-কুশলী পরবর্ত্তী কোন কবির রচনা। সে কবি কে, তাহা আবিস্কার করাও কষ্টসাধ্য নহে। বহু সংগ্রহ গ্রন্থে—বিশেষ ময়নাডলার মিত্র-ঠাকুরদের সংগৃহীত কোন কোন খাতায় এই গানটির ভণিতায় জ্ঞানদাসের নাম পাওয়া যায়। প্রধানতম পুঁথিগুলিতে এই প্রকৃতির বর্ণনার অংশটুকু বাদে বাকী চণ্ডীদাসের ভণিতায় দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, নিরাভরণা সুন্দরীর গলায় কেহ মতির মালা পরাইয়া দিলে যেরূপ হয়, জ্ঞানদাস সেইভাবে চণ্ডীদাসের পদটির অঙ্গসৌষ্ঠব সাধন করিয়াছেন।

এই যোজনায় মেঘাগমে বিরহের চিত্র অতি স্পষ্ট হইয়াছে রাধিকার ঘুমন্ত অবস্থায় দৃশ্যপটে কোন রূপের বর্ণনা সঙ্গত বা শোভন হইত না। এজন্য কবি কেবল শ্রুতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এরূপ বর্ণনা দিয়াছেন—যাহাতে ঘুমের আবেশ বৃদ্ধি হয়। কেবল সুরই তাঁহার লক্ষ্য। কর্ণ যদিও কতকটা নিষ্ক্রিয়, তথাপি যেটুক সজাগ, তাহাতে সুরের মোহ নিদ্রিতের মনে পৌঁছিতে পারে। শিশুর ঘুমন্ত অবস্থায়ও কিছুকাল জননী ঘুমপাড়ানিয়া গান আবৃত্তি করিতে থাকেন, চক্ষু যখন একেবারে মুদিত, তখনও ঘুমের অবস্থায় শ্রুতি কিছুকাল সজাগ থাকে। "রজনী শাওণ (শ্রাবণ), ঘনঘন (বারংবার) দেয়া (মেঘ) গরজন"—এখানে মেঘের সম্পদ্ বা আকৃতি সম্বন্ধে একটি অক্ষরও নাই,—মেঘের "রিমিঝিমি" শব্দে ঘুমের আবেশ বৃদ্ধি করে। বৃষ্টি-বিন্দুর রূপ হীরার মত কি মুক্তার মত, কবি তাহা বলেন নাই; কারণ শব্দই কবির লক্ষ্য। "ঝিঁ ঝিঁ ঝিমকি ঝাঁকে—ডাহকী সে গরজে" প্রভৃতিও শব্দমন্ত্র; ইহা দিয়া কবি আমাদিগকে এক ঘুমন্ত পুরীতে লইয়া গিয়াছেন। সেই মোহনিদ্রাতুর রজনীর আবেশ-বর্দ্ধক বিচিত্র সুরের রাজ্যে কৃষ্ণের স্বপ্ন-শ্রুত মধুরাক্ষরা বাণী রাধাকে

অপর কোন জগতের আকস্মিক প্রিয়-জনের আহবানের মত আবিষ্ট করিয়া ফেলিল। চণ্ডীদাসের কবিতায় এই যোজনা তাঁহার প্রিয় শিষ্য জ্ঞানদাস ভাবের সঙ্গতি রাখিয়া করিয়াছেন, এজন্য ইহাতে নিন্দার কিছু নাই।

আর একটি পদ, যাহা কোন কোন প্রাচীন পুঁথিতে চণ্ডীদাসের কোন কোনটিতে জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধেও আমার কিছু বক্তব্য আছে। সে পদাটি বিখ্যাত—

"সুখের লাগিয়া এঘর করিনু, আগুণে পুড়িয়া গেল,
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে সকলই গরল ভেল।
উচল ভাবিয়া অচলে চড়িনু, পড়িনু অগাধ জলে,
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বাড়ল, মাণিক হারালাম হেলে।
সাগর সেচিলাম, নগর বাঁধিলাম, বসতি করিবার আশে।
সাগর শুকাল, নগর ভাঙ্গিল, অভাগীর করম দোষে।"

সকলেই অবগত আছেন। জ্ঞানদাস চণ্ডীদাসের অনেক পদই নূতন করিয়া ঢালাই করিয়াছেন। এই গানে চণ্ডীদাসের সুরটী পাওয়া গেলেও ইহার মালিকানা সাব্যস্ত করা সহজ হইবে না। এখনও অনেক তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের ভাবের প্রতিধ্বনি তুলিয়াই ক্ষান্ত হন না, তাঁহার হস্তাক্ষরেরও অবিকল অনুকরণ করিয়া—কোন্‌টি গুরুর পদ, কোন্‌টি শিষ্যের, এই প্রশ্ন সময়ে সময়ে জটিল করিয়া তোলেন। জ্ঞানদাসেরও মৌলিকতা ও কবিত্বশক্তি যথেষ্ট ছিল; সুতরাং তিনি যে উদ্ধৃত পদটির মত একটি সুন্দর পদ নিজেই রচনা করিতে পারিতেন না, তাহা বলা যায় না। তবে প্রাচীনতম পুঁথির পাঠগুলি ও ভণিতাই এক্ষেত্রে প্রামান্য। অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুঁথিতে এবং মুদ্রিত পুস্তকগুলিতে দেখা যায়, কোন কোনটিতে পদটী চণ্ডীদাসের এবং কোন কোনটিতে জ্ঞানদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। খুব প্রাচীন পুঁথিতে ইহা চণ্ডীদাসের ভণিতায়ই পাওয়া যায়। কিন্তু যে ভাবে পাওয়া যায়, তাহা ঠিক উদ্ধৃত পাঠের মত নহে, কাঠামোটা ঠিক রাখিয়া পরবর্ত্তী কবি চাল-চিত্রটা অনেকখানি বদলাইয়াছেন।

সুতরাং বলা যাইতে পারে "আমি পরাণনাথেরে স্বপনে দেখিনু" পদটিতে জ্ঞানদাস যেরূপ কতকটা যোগ করিয়া সৌষ্ঠব সাধন করিয়াছেন, এই পদেও তিনি তাহাই করিয়াছেন। পদগুলিতে তিনি নিজের ভণিতা দিতে গেলেন কেন?—এই প্রশ্ন হইতে পারে। সমালোচনার আদালতে মোকদ্দমাটি উপস্থিত করিলে, জ্ঞানদাস দোষী কি না নির্ণীত হইবে; আমি শুধু এই বলিব, যে প্রাচীন ছাঁচে ঢালাই করিয়া নূতন কবির নামের ছাপ দেওয়া হয়ত সেকালের রীতি ছিল। একথাও বলা চলে

যে, গায়েনেরাই এই ভাবের ভণিতা দিয়াছেন, তজ্জন্য কবি দোষী নহেন। তাঁহারা তো ভণিতা লইয়া এরূপ খামখেয়ালী অনেক সময়েই করিয়া থাকেন। সেদিনও কবিওয়ালা এন্টোনির গানে ইঁহারা "দ্বিজ এন্টোনী বলে" এইরূপ ভণিতা দিয়া ফিরিঙ্গী কবিকে জাতে তুলিয়া লইয়াছেন।

এখনও কবিরা পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের রচনার উপর অধিকার স্থাপন না করেন, তাহা নহে। টেনিসনের রাউন্ড-টেবিলের গল্পগুলি মোবিনিজিন গাথার অনেকটা পুনরাবৃত্তি।

অভিসার

চণ্ডীদাসের গানে অভিসারের পদ একরূপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, অথচ বহুপূর্ব্ববর্ত্তী জয়দেবের পদে তাহা আছে। অলঙ্কারশাস্ত্রে 'অভিসারিকা' সম্বন্ধে অনেক নিয়ম ও রীতির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রোষিতভর্ত্তৃকা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা সম্বন্ধেও অনেক আইনকানুন আছে। প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা একবেণীধরা হইবেন, অভিসারিকা আঁধারে গা ঢাকা দিবার জন্য নীলাম্বরী পরিবেন, নূপুর ত্যাগ করিয়া নিঃশব্দে পথে চলিবেন, ইত্যাদি। কিন্তু চণ্ডীদাস নিজের মনে চলিয়াছেন, তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রতি মোটেই লক্ষ্য করেন নাই। একটি সুবিখ্যাত পদে তিনি কৃষ্ণের অভিসার বর্ণন করিয়াছেন। প্রাচীন পল্লী-গীতিকায়ও আমরা "মহিষাল বঁধুর" অভিসার ও "ধোপার পাটে" রাজকুমারের অভিসারের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছি। এই শেষোক্ত প্রণয়ীর অভিসার যে-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অনেকটা চণ্ডীদাস-বর্ণিত "এ ঘোর যামিনী মেঘের ঘটা, কেমনে আইলা বাটে" প্রভৃতি পদের অভিসারের মত। চণ্ডীদাসের এই পদটির সমালোচনা-কালে রবীন্দ্রনাথ বহুপূর্ব্বে ইহার গূঢ় অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন। তিনি কতকটা এই ভাবে কবির কবিত্ব ও রচনানৈপুণ্য বুঝাইয়াছিলেন, (সকল কথা আমার মনে নাই ও সেই সমালোচনাটিও এখন সুলভ নহে)। কবি তাঁহার কথার ফাঁকে এমন সকল কথা বলিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা বুঝা যায়—রাধার বলিবার উদ্দিষ্ট এক ব্যক্তি নহে। তিনি কখনও কৃষ্ণকে, কখনও সখীকে, কখনও বা নিজেকেই নিজে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, অথচ কাহাকে তিনি সম্বোধন করিতেছেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই।

আমরা তদ্রচিত "কাহারে কহিব মনের মরম, কেবা যাবে পরতীত" পদের আলোচনা-কালে বলিয়াছিলাম, কবির কথায় অনেক ছেদ থাকে, তিনি সমস্ত কথা বলেন নাই; যাহা বলিয়াছেন, তাহা ছাড়া অনেক ইঙ্গিত করিয়াছেন—সমঝ্দার পাঠক সেই সকল ফাঁক পূর্ণ করিবেন। এখনকার কাব্যক্ষেত্র অনেক সময়ে বাক্পল্লব ও আগাছায় পূর্ণ, সেক্ষপীয়রের "Brevity is the soul of wit" নীতি-পালনের লোক খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। কিন্তু চণ্ডীদাস যখন ভাবে আবিষ্ট হইয়া যাইতেন, তখন গূঢ় অনুভূতির দরুণ বাজে কথা, এমন কি বক্তব্য বিষয় বুঝাইবার পক্ষে যাহা কতকটা দরকার, তাহাও তাহার বলিবার একান্ত অবসর হইত না।

"এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা, কেমনে আইলা বাটে?"

এ কথাটা রাধা স্পষ্টই কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন। তাহার পরে যেন মুখ ফিরাইয়া সখীকে বলিতেছেন—

"আঙ্গিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে, দেখে যে পরাণ ফাটে।"

তারপর জনান্তিকে বলিতেছেন—

"ঘরে গুরুজন, ননদী দারুণ, বিলম্বে বাহির হৈনু।"

এবং আবার কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

"আহা মরি মরি সঙ্কেত করিয়া কত না যাতনা দিনু।"

তারপর পুনশ্চ সখীর প্রতি—

"বঁধুর পীরিতি আরতি দেখিয়া, মোর মনে হেন করে,
কলঙ্কের ডালি মাথার করিয়া, অনল ভেজাই ঘরে।
আপনার দুঃখ, সুখ করি মানে, আমার দুঃখের দুঃখী,
চণ্ডীদাস কহে কানুর পীরিতি, শুনিয়া জগৎ সুখী।"

এই পদটিতে একটা প্রচ্ছন্ন নাট্যকৌশল উপলব্ধ হইবে। রাধা ঘুরিয়া ফিরিয়া বারংবার মুখ ফিরাইয়া যাহা বলিতেছেন, কবি যেন তাহা মানস-কর্ণে শুনিতেছেন এবং মানস চক্ষে সে দৃশ্য দেখিতেছেন; তিনি যাহা শুনিতেছেন বা দেখিতেছেন, তাহাই বলিয়া যাইতেছেন। আত্মবিস্মৃত কবি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার কথা শুনিবার জন্য বাহিরের লোক কাণ পাতিয়া আছে, তাহাদের জন্য পরিচয়ের ভূমিকাটার দরকার ছিল। এই সম্পূর্ণ আত্মস্থভাব শুধু মহাকবিদের মধ্যেই দেখা যায়। বাল্মীকির রামায়ণে এইরূপ দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝে আছে। এমনও হইতে পারে যে, যাঁহারা সেকালে চণ্ডীদাসের গান গাইতেন, তাঁহারা অঙ্গুলী-সঙ্কেত ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা কবির অকথিত কথাগুলি পূরণ করিয়া বুঝাইতেন।

ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে আমার অভিসারিকাদের সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমাদের দেশে পুরুষেরাই নায়িকার কাছে যায়। নায়িকারা কখনই এ-ভাবে মিলনের জন্য অভিসারে যাত্রা করেন না। এই রীতি নারী-প্রকৃতির স্বাভাবিক লজ্জাশীলতার বিরোধী।" উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম—"যে-দেশে নারী ও পুরুষ স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করেন এবং একে অন্যের কাছে যখন-তখন যাওয়া-আসা করিতে পারেন, সেখানে পুরুষের যাওয়া ঠিক ও সঙ্গত; কিন্তু আমাদের অন্তঃপুরের অবরোধের মধ্যে পুরুষের প্রবেশ অসম্ভব। পুরুষ কি

করিয়া কোন নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে? সুতরাং নারীকেই সংগোপনে চুরি করিয়া বাহির হইতে হয়—ভ্রমরের সন্ধানে ফুলকেই বাহির হইতে হয়।”

অভিসারের অধ্যায় বৈষ্ণব কবিতা-রত্নমালার মধ্যমণি-স্বরূপ। বিদ্যাপতি অভিসারের অনেকগুলি পদ লিখিয়াছেন, তাহা অলঙ্গারশাস্ত্রের অনুবর্ত্তী শব্দচ্ছন্দ ও ভাবের ঐশ্বর্য্যে ঝলমল—

“জিনি করিবর রাজহংস-গতি গামিনী চললহি সঙ্কেত গেহা।
অমল তড়িতদণ্ড হেমমঞ্জরী জিনি অতি সুন্দর দেহা।
কনকমুকুর শশী কমল জিনিয়া মুখ বিম্ব-অধর পবারে।
দশনমুকুতাপাঁতি কুন্দ করগ বীজ জিনি কুম্বু কণ্ঠ-আকারে।”

এই ভাবে পদের পর পদ চলিয়াছে, অলঙ্কারে বোঝাই যেন একখানি পান্‌সী নৌকা চলিয়াছে। শব্দগুলি শ্রুতির চমকপ্রদ, কিন্তু সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য ও উপমা-উৎপ্রেক্ষা যেন অভিসারিকার গতি কতকটা রোধ করিয়া ফেলিয়াছে। চৈতন্যপ্রেমের বন্যায় কিছু পরে অভিসারিকার ডিঙ্গি আশ্চর্য্য গতিশীলতা লাভ করিয়াছিল।

প্রেমের জন্য অভিসার কি, তাহা চৈতন্যদেব বুঝাইয়া দিলেন। ঘর বাড়ী, আত্নীয় স্বজন—সমস্ত ত্যাগ করিয়া প্রেমযাত্রী কি ভাবে অভিসার করেন, তাহার একখানি সুস্পষ্ট পট কবিরা এবার চোখের সামনে দেখিতে পাইলেন। সে প্রেম-যাত্রীর রূপ কি কখনও ভোলা যায়? সংকীর্ত্তনের মধ্যে যে পরমানন্দের মূর্ত্ত-রূপ তাঁহারা দেখিলেন, তাহা তাঁহাদের হৃদয়ে ভাবোচ্ছ্বাস বহাইয়া দিল। বৈষ্ণব কবিরা এই অভিসারের রূপক দিয়া চৈতন্যকে যতটা বুঝাইয়াছেন, তাঁহার চরিতকারেরা তাহা পারেন নাই। এখানে রাইকিশোরীর মূর্ত্তি যেরূপ ফুটিয়াছে, বৈষ্ণব কবিতায়ও অন্য কোন স্থানে তাঁহার রূপ তদ্রুপ ফোটে নাই। এজন্য বৈষ্ণবেরা অভিসারের নাম রূপাভিসার দিয়াছেন। যিনি রূপের ফাঁদে পা দিয়া, সেই আনন্দ-স্বরূপের সন্ধানে যাইতেছেন, তিনি প্রেমিকের চক্ষে অপূর্ব্ব রূপসী। রাধা এজন্য বলিতেছেন:—

“তোমার গরবে, গরবিনী হাম, রূপসী তোমার রূপে।”

রমণী-মণি শ্যাম-অভিসারে যাইতেছেন, মুখখানি পূর্ণেন্দুর মত—

"একে সে তরুণ ইন্দু, মলয়জ বিন্দু বিন্দু,
কস্তুরী-তিলক তাহে রাজে,
পিঠে দোলে হেম ঝাপা, রঙ্গিয়া পাটের খোঁপা,
নাসার মুকুতারাজি সাজে।"

"শ্যাম-অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা,
নীলবসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা।
সুকুঞ্চিত কেশে রাই বাঁধিয়া কবরী,
কুন্তলে বুকলমালা গুঞ্জরে ভ্রমরী।

নাসার বেশর দোলে মারুত-হিল্লোলে,
নবীন কোকিলা যেন আধ-আধ বোলে।
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া
বৃন্দাবনে প্রবেশিল শ্যাম জয় দিয়া।"

অভিসার বর্ণনা করিতে করিতে কবি অনন্ত দাস চৈতন্যের ভাবে আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ সে রাধা রূপক হইলেও, চৈতন্যেরই রূপ। অনন্ত দাস চৈতন্যের সমসাময়িক কবি, সংকীর্ত্তন-কালে তাঁহারই মুখ দেখিয়া অভিসারিকাকে আঁকিয়াছেন। অনন্ত দাস সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সেই রুপ দেখিয়া তিনি অলঙ্কারশাস্ত্র ভুলিয়া গেলেন। এই শাস্ত্রের নির্দ্দেশে মুখর নূপুর পা হইতে খুলিয়া ফেলিয়া নিঃশব্দে যাইতে হয়; ("মুখরমধীরং ত্যজ মঞ্জীরং")—কিন্তু কবি লিখিলেন, "চৌদিকে রমণী সাজে, ডম্ফ রবাব বাজে"—সমস্ত আইন-কানুন উলটপালট হইয়া গেল, প্রেমযাত্রী এখানে রণ-যাত্রীর ন্যায় নির্ভীক; কলঙ্কের ভয় আর নাই—ডম্ফ, রবাব, রামশিঙ্গা বাজাইয়া চলিয়াছেন। ডম্ফ, অর্থাৎ জয়ঢাক, এত বড় এই যন্ত্র যে, একজন পিঠে বহে আর একজন বাজাইতে বাজাইতে যায়, তাহার প্রবল শব্দে দশদিক্ প্রকম্পিত হয়। এক কবি রাধার মুখে বলিতেছেন "ননদিনী তুই বল্ গিয়ে নাগরে, ডুবেছে রাই রাজ-নন্দিনী কৃষ্ণপ্রেম-কলঙ্ক-সাগরে।" অলঙ্কারশাস্ত্রের ক্ষীণপ্রাণা ভীরু অভিসারিকা এত জোর পাইবে কোথা হইতে? অভিসারিকার আর এখানে সে-যুগের ভয়-শঙ্কিতা মূর্ত্তি নাই, এই যুগের অভিসার অর্থ কৃষ্ণপ্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, কৃষ্ণ-প্রেমে গর্ব্বিত চৈতন্যের সংকীর্ত্তন, যাহারা কাজীর ফৌজের মাথায় ঢিল ছুঁড়িয়াছিল।

মনে হইতে পারে—সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের কথা এতটা স্পষ্ট করিয়া বলাতে কবিত্বের দিক্ হইতে কবি পথ-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু তিনি তাহা হন নাই।

যিনি চৈতন্যকে কীর্ত্তনের মধ্যে দেখিয়াছেন—"কত সুরধুনী বহে ও দুটি নয়নে"—ধারাহত পদ্মের ন্যায় অশ্রুপ্লাবিত শ্রীমুখের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন, তিনি কাব্য-রস বিচ্যুত হইবেন কেন? কাজীর বাড়ীর কাছে চৈতন্যের মহাসংকীর্ত্তনের বর্ণনা কালে বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন, সেই কীর্ত্তনে শত শত মশালে ও দেউটির আলোকে নদীয়ার রাত্রি দিনের মত উজ্জ্বল হইয়াছিল। কিন্তু যাহার "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী" অবনী বহিয়া যায়, সেই গোবিন্দের অশ্রুসিক্ত মুখখানি কীর্ত্তনে যে-যে জায়গায় জাগিয়া উঠিত, সেখানে সেই মুখ-শোভা দেখিবার জন্য শত শত দীপ জ্বলিয়া উঠিত ও জনতার ভীড় তথায় উদ্দাম হইয়া উঠিত। তাঁহার সেই 'সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবালেহপিবম্যং' শুধু কুঞ্চিত কেশদামশোভিত মুখখানি, এবং কৃষ্ণবিরহ খিলক "পরিমুদিত ইব মৃণালী" তনু যে দেখিত, তাহার হৃদয়ে কি কবিত্বের উৎস কখনও শুকাইতে পারে!

অনন্ত দাস লিখিয়াছেন,—

"চলাইতে চরণের সঙ্গে চলে মধুকর, মকরন্দ পান কি লোভে?
সৌরভে উনমত, ধরণী চুমুয়ে কত, যাঁহা যাঁহা পদ-চিহ্ন শোভে।"

গৌরহরি বলিতেছেন—

"ছুটিল পদ্মের গন্ধ বিমোহিত করি,
অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌরহরি।"

এখানে রাধার অঙ্গে পদ্ম-গন্ধ, ভ্রমরগণ সেই ঘ্রাণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার কাছে উড়িয়া বেড়াইতেছে, এদিকে রাধার আল্‌তা-রঞ্জিত চরণচিহ্ন মাটীর উপর পড়িতেছে, সেই রক্তিম চিহ্নকে পদ্ম ভ্রম করিয়া ভ্রমরগুলি মৃত্তিকা চুম্বন করিতেছে। অনন্তদাসের কবিত্ব সাম্প্রদায়িক জটিল রূপকের মধ্যে পড়িয়া হারাইয়া যায় নাই—তিনি লিখিয়াছেন— "রাজহংসী জিনি, গমন সুলাবণী"; এই পদে 'সুলাবণী' শব্দটির প্রতি লক্ষ্য করুণ। এই শব্দ ব্যাকরণশুদ্ধ নহে, এমন কি চলিত কথাও নহে, স্বর্ণকারের মত সংস্কৃতের সোণা গড়িয়া পিটিয়া তিনি এই শব্দটি রচনা করিয়াছেন।

"কিবা কনকলতা জিনি, জিনি সৌদামিনী, বিধির অবধি রূপ সাজে।"

এখানে "বিধির অবধি রূপ"—অর্থাৎ বিধাতার যতটা শক্তি তাহা তিনি রাধার রূপ-সৃষ্টিতে প্রয়োগ করিয়াছেন, সুতরাং পদগুলি কবিত্বহীন, এ কথা কেহ বলিতে পারিবেন না।

এই অভিসার লইয়া বৈষ্ণব কবিরা নূতন নূতন কত শ্রেণীই না বিভাগ করিয়াছেন! চৈতন্য বর্ষা-বাদলে, অমানিশার ঘোর অন্ধকারে, রৌদ্রোজ্জ্বল দিবা-দ্বিপ্রহরে, জ্যোৎস্নাময়ী নিশীথিনীতে হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইয়াছেন, তাঁহার এই অভিসার নানা সময়ে নানা স্থানে নব নব রূপের সৃষ্টি করিয়াছে। কৃষ্ণের রূপের সন্ধান যে পাইয়াছে, তাহার মুখে চোখে সেই রূপের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, তাহারও রূপের অন্ত নাই। সেই রূপের যথাযথ চিত্র আঁকিতে যাইয়া কবিরা কি অলঙ্কারশাস্ত্রের খাতিরে বাদসাদ দিতে সম্মত হইতে পারেন? এইজন্য এই অভিসারের চিত্র বিচিত্র, শাস্ত্র-বিমুক্ত এবং অভিনব। কবিরা অলঙ্কারশাস্ত্রের নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদের কাব্যে যেরূপ বর্ষা-রাত্রির অভিসার আছে, তেমনই জ্যোৎস্নার অভিসার আছে। অমানিশির অভিসার ও দিবাভিসার—উভয়ই তাঁহারা বর্ণনা করিয়াছেন এবং বাধ্য হইয়া বৈষ্ণব আলঙ্কারিকেরা তাঁহাদের শাস্ত্রে অভিসারের এই সকল নব পর্য্যায় মানিয়া লইয়াছেন।

অভিসার-বর্ণনাকারী কবিদের মধ্যে গোবিন্দদাস শ্রেষ্ঠ; তাঁহার পদাবলীতে কবিত্ব, পদমাধুর্য্য এবং অধ্যাত্মসম্পদ্ এত বেশী যে, তাহা যেরূপ কাব্য রসাস্বাদির পক্ষে উপাদেয়, সাধকের পক্ষেও তাহা কম উপভোগ্য নহে। যে দুঃখসহ বিপদের পথ অতিক্রম করিয়া রাধা কৃষ্ণের কাছে উপনীত হইয়াছেন, তাহার বর্ণনা আমাদিগকে একটা কাল্পনিক জগতে লইয়া যায়; কিন্তু গূঢ় অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিলে, সাধন-ক্ষেত্রে উহা ভক্তের সিদ্ধির ইঙ্গিত-স্বরূপ প্রতীয়মান হইবে।

"মন্দির ত্যজি যব পদচারি আইনু, নিশি দেখি কম্পিত অঙ্গ,
তিমির দুরন্ত, পথ হেরই না পারই, পদযুগ বেড়ল ভুজঙ্গ।
একে কুলকামিনী, তাহে কুহু যামিনী, ঘোর গহন অতি দূর,
আর তাহে জলধর বরখিয়ে ঝর ঝর, হাম যাওব কোন পুর।
একে পদ-যুগ্ম পঙ্কে বিভূষিত, কন্টকে জর জর ভেল।
তুয়া দরশন-আশে কিছু নাহি জানিনু চিরদুঃখ অব দূরে গেল।
তোহারি মুরলী যব শ্রবণে পশিল, ছোড়ল গৃহসুখ আশ।
পথহু দুঃখ তৃণ করি মানিনু, কহতহি গোবিন্দদাস।"

"কুহু যামিনী" অর্থে অমানিশা। এই ঘনান্ধকার বাদলে অমানিশায় ঘোর গহন পথে রাধা কোন্ পুরে যাইতেছেন? কৃষ্ণ তাঁহাকে দেখা দেওয়ার আশ্বাস দিয়া কোন্ পথে লইয়া যাইতেছেন, সে পথ বৃন্দারণ্যের শ্যামকুঞ্জে কিংবা যোগী-ঋষির অধ্যুষিত কোন নিবিড় গিরিগুহায়, তাহা রাধা জানেন না। শুধু মুরলীর ধ্বনি শুনিয়া, পথ-বিপথ গণ্য না করিয়া তিনি ছুটিয়া আসিয়াছেন। যেদিন তিনি তাঁহার সেই ডাক শুনিয়াছেন, সেই দিনই তাঁহার গৃহ-লোপের চিন্তা লুপ্ত হইয়াছে এবং সাধন-পথের এই সমস্ত ভীষণ কষ্ট তৃণবৎ উপেক্ষা করিয়াছেন। এই সুললিত ও সুমিষ্ট শব্দে গ্রথিত পদটি কি অধ্যাত্মপথের স্পষ্ট ইঙ্গিত নহে?

কৃষ্ণদর্শনের এই যে দুর্দ্দমনীয় আবেগ ও গতিশীলতা, তাহা বিষ্ণুপদচ্যুতা সুরধূনীর স্রোতেরই মত। ইহা সাধারণ নায়ক-নায়িকা সন্ধন্ধে প্রযুজ্য নহে। এইজন্যই ইহা এমন নিছক কবি-কল্পনা ও গূঢ়-রহস্য-জড়িত ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে, যে—জড়বাদীরা ইহার মর্ম্ম তেমন বুঝিবেন না, যেরূপ ভাবপ্রবণ প্রেমিক বুঝিবেন।

"মন্দির বাহিরে কঠিন কপাট,
চলইতে শঙ্কিত পঙ্কিল বাট,
তাহে অতি দূরতর বাদল-দোল,
বাকি কি বারই নীল নিচোল।
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহু মানস সুরধনীপার।
ঘন ঘন ঝন্ ঝন্ বজর-নিপাত,
শুনইতে শ্রবণে, মরমে মরি জাত।
দশদিশ দামিনী দহই বিথার,
শুনইতে উচকই লোচন-তার।
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ,
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ।
গোবিন্দ দাস কহে ইথে বিচার,
ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিঘার।"

সংসার টিটকারী দিতেছে—শত হস্ত বাড়াইয়া রাধাকে নিরস্ত করিতে চাহিতেছে। তুমি হরির সন্ধানে কোথায় যাইবে—ইহা দুরাশা; তিনি মানস-গঙ্গার ও-পারে আছেন (মনোনবদ্বারনিষিদ্ধ-বৃত্তি আত্মসমাহিত যোগী শুধু যাঁহাকে পান)—তাঁহাকে পাইব বলিলেই কি পাওয়া হয়? এই ঘন ঘন বজ্রপাত, বিদ্যুতের চকিত

আলোকে চক্ষের তারা ঝলসিয়া যাইতেছে। তুমি কি প্রেমের জন্য দেহকে এমন করিয়া উপেক্ষা করিবে?

গোবিন্দদাস বলিতেছেন, এখন কি আর এ বিষয়ে বিচারের অবকাশ আছে? বাণ হস্তচ্যুত হইয়াছে, এখন আর শত চেষ্টায়ও তাহার গতি ফিরান যাইবে না।

এই গীতে আবার সেই স্পষ্ট ইঙ্গিত। গোবিন্দ দাসের চক্ষের সম্মুখেই কত কুবের-তুল্য ধনাঢ্য ব্যক্তি, কত রাজপুত্র কৃষ্ণপ্রেমে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, দুর্গম পথের কষ্ট শিরোধার্য্য করিয়া, ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেলেন, সে ছিল বাঙালার ত্যাগ-ধর্ম্মের সুবর্ণ-যুগ। সুতরাং গোবিন্দ দাসের কবিতা কল্পনালোকের কথা নহে, সেই অধ্যাত্ম-কল্প-লোকেরই কথা। কৃষ্ণ যমুনাতীরে আছেন, কিম্বা রাধাকুণ্ডের তীরে আছেন, সে সকল মামুলী কথা তিনি বলেন নাই। তিনি ধ্যানলোকে বসিয়া, সমস্ত লৌকিক সংস্কার ও কবিপ্রসিদ্ধির এলাকা ছাড়িয়া দিয়া বলিয়াছেন—"হরি রহু মানস-সুরধুনী-পার" এবং রাধাকে বলিতেছেন, "তুমি কেন অভিসার করিয়া মরিবে?—তাঁহাকে পাইবে না ("সুন্দরী কাহে করবি অভিসার")!" কেবলই অধ্যাত্ম-তথ্যের ইঙ্গিত দিয়া তিনি কাব্যের মর্যাদা ক্ষুন্ন করেন নাই, কবিদের পথেই চলিয়াছেন—

"তাহে অতি দূরতর বাদল-দোল,
বারি কি বারই নীল নিচোল।"

বর্ষার অবিরত বৃষ্টিপাতে দূর-প্রসারিত অরণ্যের রেখা পর্য্যন্ত দোল খাইতেছে। তুমি কি এই ক্ষীণ নীল শাড়ীর আঁচল দিয়া সেই বাদলের বেগ নিবারণ করিতে পারিবে?

ইহার পরে গোবিন্দ দাসের অভিসারের আর একটি পদ উদ্ধৃত করিব, তাহা একেবারেই মর্ত্ত্যেলোকের কথা নহে। তন্ত্রোক্ত শব-সাধনা, যেখানে সাধক শবের উপর বসিয়া তপস্যা করেন—পঞ্চাগ্নিকের দুশ্চর প্রচেষ্টা, যেখানে তিনি গ্রীষ্মকালে চারিদিকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের দুঃসহ তাপ সহ্য করিয়া পঞ্চম অগ্নি-স্বরূপ মধ্যাহ্নের প্রখর মার্ত্তণ্ডের দিকে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকেন—শত কল্পারূঢ় যোগীর নিশ্চল আসন, যেখানে তিনি অনাহারে অনিদ্রায় তপশ্চরণ করেন—এই পদোক্ত প্রেমিকের সাধনা তাদেরই এক পাঙ্‌তেয়। প্রভেদ এই যে, তপস্বীরা বহুকষ্টে সংযমী হইয়া তপস্যা করেন, কিন্তু প্রেমিকের তত্তুল্য বা ততোধিক কষ্ট অনুরাগের সহিত বলিয়া তৃণবৎ উপেক্ষিত হয়। কবি বলিতেছেন;—

''কন্টক গাড়ি', কমল সম পদতল মঞ্জীর চীয়হি ঝাঁপি'
গাগরি-বারি ঢারি, করি পিছল পথ, চলিছি অঙ্গুলী চাপি।
মাধব তুয়া অভিসারক লাগি'।
দূরতর পন্থা গমন ধনী সাধয়ে,
মন্দিরে যামিনী জাগি;
কর-যুগে নয়ন মুদি' চলু ভামিনী,
তিমির পয়ানক আশে।
মণি কঙ্কণ পণ ফণি-মুখ-বন্ধন,
শিখই ভুজগুরুপাশ।
গুরুজন-বচন বধির সম মানই,
আন শুনই কহ আন।
পরিজন-বচনে মুগধি সম হাসই,
গোবিন্দ দাস পরমান।''

ইহা সামান্য নায়িকার অভিসার নহে—যে, একটু ইশারা পাইলেই ইডেন-গার্ডেন বা গোল-দীঘির বেঞ্চে বসিয়া গল্প করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিবে কিম্বা লেক-রোডে একত্র ঘুরিয়া বেড়াইবার লোভে ছুটিয়া যাইবে। এই অভিসারের জন্য তৈরী হইতে হইলে, যুগ যুগের তপশ্চরণের দরকার। আঙ্গিনায় কাঁটা পুতিয়া, কলসী কলসী জল ঢালিয়া কন্টকাকীর্ণ পিচ্ছল পথে যাতায়াত শিখিতে হইবে, পায়ের নূপুরের কলস্বন চীর-খণ্ডে বন্ধ করিয়া সারা রাত্রি আঙ্গুল চাপিয়া হাঁটা অভ্যাস করিতে হইবে এবং আঁধার পথে যাওয়া শিখিবার জন্য চক্ষু বুজিয়া পথে চলিতে হইবে—কারণ "আমার যেতে যে হবে গো—রাই ব'লে বাজিলে বাঁশী", তখন তো আমি এক মুহূর্ত্তও ঘরে অপেক্ষা করিতে পারিব না। রাধিকা সর্পসঙ্কুল পথে চলা-ফেরা শিখিবার জন্য ভূজগ গুরুর (ওঝার) নিকট নিজ মণিময় কঙ্কণ-মূল্য (পণ) দিয়া সাপের মুখ কিরূপে বন্ধ করিতে হয়, তাহাই শিখিতেছেন; গুরু-জন যখন ভর্ৎসনা করেন, তখন তিনি বধির হইয়া থাকেন—যেন কিছুই শুনিতে পান না। বাহিরের লোক উপদেশ দিতে আসিলে, যেন তিনি তাঁহাদের কথা বুঝেন নাই—পাগলীর মত (মুগ্ধী) অকারণে হাসেন। এই সকলই সংসার হইতে বাহির হইবার যোগ্যতার্জ্জনের শিক্ষা এবং ইহা প্রেমের পথে তাঁহাকে পাইবার তপস্যা। কবি নিজেই ইহাকে সাধনা বলিয়াছেন ("দূর তর পন্থা গমন ধনী সাধয়ে")।

মান

মানুষের যতগুলি ভাব প্রণয়-ব্যাপারে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সবগুলি কবিরা রাধা-কৃষ্ণ-লীলায় আরোপ করিয়াছেন। ধরুন—মান। কোথায় সেই অব্যক্ত, অনন্ত, শত শত বিশ্বের অধিপতি, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর—আর ধূলি-কণার কোটী-কোটীর অংশের একটি নগণ্য রেণুর মত মানুষ! সেই রেণু ভগবানের সঙ্গে মান করিবে এবং তিনি সেই রেণুর পা ধরিয়া মান ভাঙ্গাইবেন? সাধারণের নিকট এই তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অনধিগম্য, সিন্ধুর সহিত বিন্দুর মান, ইহা শিশুর কল্পনা।

কিন্তু তিনি তো অণু হইতেও অনীয়ান্; এত বড় তিনি, কিন্তু ক্ষুদ্রের উপরও তাঁহার পূর্ণ দৃষ্টি, পূর্ণ ভালবাসা। পর্ব্বতের ছায়া বিশাল জলধির বক্ষে যেরূপ পড়ে, একটি ক্ষুদ্র জলবিন্দুর উপরেও তেমনই পূর্ণভাবে পড়ে। ক্ষুদ্রের নিকট তিনি ক্ষুদ্র। এই বিরাট্ বিশ্বের কর্ম্মশালায় কত সহস্র, কত কোটী বৃহৎ যন্ত্র কাজ করিতেছে; আবার একটি জীবাণুর শরীরেও সূক্ষ্ম শিরা, উপশিরা তেমনই পূর্ণভাবে ক্রিয়াশীল—ক্ষুদ্র বলিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম যন্ত্রগুলির কোনটিই অপূর্ণ বা অঙ্গহীন নহে। সেই বহুরূপী বিরাট্ পুরুষবর আমার কাছে আমারই মত হইয়া আসেন। ভগবানের এই সর্ব্বব্যাপক, সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয়ের উপযোগী, বৈষম্যহীন রূপভেদ স্বীকার করিলে মান-লীলা, দান-লীলা, নৌকা-বিলাস বুঝিতে কষ্ট হইবে না। এক সাধু আমাকে বলিয়াছিলেন—"রাধা-কৃষ্ণ লীলা দেখিবে? সৌর-কেন্দ্রে সূর্য্য তাঁহার জ্যোতিষ্কমণ্ডলীকে লইয়া কতই খেলা করিতেছেন—তাহাদিগকে অনুরাগের বন্ধনে বাঁধিয়া কখনও কাছে আনিয়া, কখনও দূরে রাখিয়া ঋতুভেদে লীলা করিতেছেন—আমার কাছে ইহাই রাধাকৃষ্ণের লীলা। আবার একটি ক্ষুদ্র ফুলকে লইয়া ভ্রমর কত কথাই না গুঞ্জন করিয়া বলিতেছে—কখনও ফুলটি নতমুখে তাহা শুনিতেছে, কখনও ঘাড় নাড়িয়া ভ্রমরটিকে 'যাও, যাও' বলিয়া সরাইয়া দিতেছে—আমার কাছে ইহাই রাধাকৃষ্ণের লীলা। প্রেমের অঞ্জন চক্ষে পরিয়া এস, দেখিবে জগৎ ব্যাপিয়া এক অফুরন্ত লীলা চলিতেছে; গাছে গাছে, পল্লবে পল্লবে, নদীতে ও সিন্ধুতে গ্রহ-উপগ্রহে—সকলেই ভালবাসায় ধরা দিয়াছে—ইহাই নিত্যবৃন্দাবনের নিত্য উৎসব।"

এই জগৎকে প্রেরণা দিতেছে বাসনা। খাদ্য, আশ্রয়, ধন, মান, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা ইত্যাদির লোভে মানুষ সারাজীবন প্রতিনিয়ত প্রবৃত্তির পথে ঘুরিতেছে। কাম্যলাভের ব্যপদেশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ঝগড়া বিবাদ ও লড়াই চলিতেছে। এই কাম্যের পাছে পাছে দিবারাত্র খুনোখুনি ব্যাপার—উহা এবিসিনিয়া বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধই হউক, বা সামান্য জ্ঞাতিঘটিত মোকদ্দমাই

হউক। কিন্তু যে ফিরিয়া বসে, যে বলে এই সকল কাম্যবস্তুর কিছুই আমি চাই না, এগুলি ক্ষণস্থায়ী ও অসার, বাহিরের ঘটা দেখিয়া সে ভোলে নাই; কিন্তু যে বিশ্বের প্রাণস্বরূপ, জীবের প্রাণস্বরূপ, যিনি মনের মন, প্রাণের প্রাণাধিক, যাঁহার শ্রীমুখের অণু-পরমাণু শোভা লইয়া সরসীতে পদ্ম ও বনে-উপবনে গোলাপ-কুন্দ-যূঁই-মল্লিকা ফুটিতেছে, যাঁহার অপরূপ লাবণ্যের এক তিল প্রিয়তমার মুখে ও শিশুর হাস্যে প্রকাশ পাইয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিতেছে, শত কুসুম ও শত চন্দনতরুর সুঘ্রাণে যাঁহার অঙ্গগন্ধ ঘোষিত হইতেছে, শত মধুচক্র, খর্জ্জুর-আম্র-পনস-ইক্ষু যাঁহার অমৃতরসের সন্ধান দিতেছে, যিনি সমস্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য ও আনন্দের উৎস-স্বরূপ—তাঁহাকেই মাত্র যদি কেহ চাহিয়া, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গতি-মুখ ফিরাইয়া তাঁহারই জন্য প্রতীক্ষা করে—সেইরূপ অসামান্য ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব অন্যদেশ সহসা বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু তাহা ভারতে অবিদিত নহে। যে ব্যক্তি এইভাবে বৈষ্ণবী মায়া কাটাইয়াছে, সে তাঁহার সহিত সমান আসনের দাবী করিতেছে। দেবতার মধ্যে একমাত্র শিব ও ব্রহ্মা এই বৈষ্ণবী মায়ায় ধরা দেন নাই। এদিকে বিষ্ণুও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। কৈলাসের রত্নময় পুরী শিবকে দিয়া তিনি কুবেরকে তাঁহার ভাণ্ডারী নিযুক্ত করিয়া দিলেন; কিন্তু শিব শ্মশানে-মশানে ফিরেন, বুড়ো বলদের উপর শওয়ার হন, উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া বা ঐরাবত হাতীর দিকে ফিরিয়াও তাকান না। চন্দন, অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্যের তাঁহার কাছে কোন মূল্যই নাই; ভস্ম-চন্দন ও শ্মশানের নর-কঙ্কাল তাঁহার অঙ্গের সৌষ্ঠব সাধন করে।

শিব ও ব্রহ্মা—এই দুই দেবতামাত্র বিষ্ণুমায়ায় অভিভূত হন নাই। নিবৃত্তির স্বর্গে আর কোন দেবতার প্রবেশাধিকার নাই।

গ্রাম্য কবি লিখিয়াছেন—

> ''বিকায় নাকো অন্য সুতো, বিনে তাঁতি নন্দের সুত
> সে হাটের প্রধান তাঁতি, প্রজাপতি, পশুপতি,
> আর যত আছে তাঁতি, তাঁদের শুধু যাতায়াত।''

স্বয়ং বিষ্ণুর ছাপ-মারা সুতোই এই হাটের একমত ক্রয়-বিক্রয়ের পণ্য। বিষ্ণু নিজে চৈতন্যপার্ষদ পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মত ভোগের মুখোস-পরা নিবৃত্তির দেবতা। তাঁহার আবাস-স্থান তিমি-নক্র-তিমিঙ্গিল-সঙ্কুল উত্তাল তরঙ্গ ও আবর্ত্তময় মধ্য সমুদ্র, তথায় তাঁহার শয্যা একটি বট পত্র, মস্তকোপরি শতশীর্ষ বিষধর ভীষণ অনন্ত নাগের লেলিহান জিহ্বা; এই ভয়ঙ্কর স্থান ও পরিবেষ্টনীর মধ্যে তিনি যোগ-নিদ্রায় নিদ্রিত—এই অবস্থায় কি কাহারও চক্ষে ঘুম আসিতে পারে, কিন্তু পরম নির্ব্বিঘ্ন যোগেশ্বরের যোগ-সমাধির ইহাই উপযোগী স্থান। ঈদৃশ দেবতার নিকট যে

ভক্ত যাইতে ইচ্ছা করিবে, শত কষ্টিপাথরে কষিয়া সে মেকী কিনা তিনি পরীক্ষা করিয়া লইয়া থাকেন। যে ভোগৈশ্বর্য্যবিমুখ হইয়া নিবৃত্তির পথে যাইতে চাহিবে, বৈষ্ণবী মায়া তাহাকে ফিরাইবার জন্য কত প্রলোভন ও কত বিভীষিকা প্রদর্শন করে, তাহা যিশুর সয়তান কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হওয়ার কাহিনী, বুদ্ধদেবের মারের সহিত সংঘর্ষ ও শিবকৃত মদনভস্মের পরিকল্পনায় কবিরা আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। এই নিবৃত্তিপন্থীকে টলাইবার জন্য ইন্দ্রদেব সর্ব্বদা অপ্সরীদিগের শরণ লইয়াছেন, সে সকল গল্প পুরাণকারেরা রচনা করিয়া এই সত্য প্রমাণ করিয়াছেন যে, যাঁহারা ভোগের পথ ছাড়িয়া যোগের পথে যাইতে চাহেন, প্রকৃতি তাহাদিগকে লুব্ধ করিবার জন্য সতত প্রয়াসী। ভিখারী রাস্তায় রাস্তায় সারাদিন চীৎকার করিয়া মুষ্টি ভিক্ষা পাইতেছে না, কিন্তু ভোগবিমুখ নিবৃত্তিকামী সাধুকে ভুলাইবার জন্য ধনকুবেরগণ তাঁহাদের ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া দিতেছেন; সন্ন্যাসী তাহার নেংটী ছাড়িতেছে না, দিগম্বর সন্ন্যাসী সেই নেংটীটুকুও ফেলিয়া দিয়াছেন। এ যুগের প্রধান অস্ত্র অর্থের মুখ ভোতা হইয়া গেল, গান্ধিজী তাঁহার আটহাতী খদ্দর ছাড়িলেন না, এবং চার্চ্চহিলের কটুক্তি তাঁহার কাছে পুষ্পবৃষ্টির মত বোধ হইল।

সুতরাং এবম্বিধ ত্বৎ-সমর্পিত প্রাণ—একান্তভাবে ত্বদগত ও ত্বদবলম্বিত ব্যক্তির মান ভাঙ্গিতে যে ভগবান সাধ্যসাধনা করিবেন, বৈষ্ণবদের এই কল্পনার ভিত্তি-মূলে কতকটা পারমার্থিক সত্য নিহিত আছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বৈষ্ণবেরা নিবৃত্তির পথ মধুরাদপি মধুর করিয়াছেন—তাহা অনুরাগের দ্বারা পুষ্পাকীর্ণ করিয়া। মান-অধ্যায়ের ভূমিকা-স্বরূপ এইটুকু বলিয়া আমরা পদাবলীর উদ্যানে পুনরায় প্রবেশ করিব। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দ দাসের পরে মান সম্বন্ধে কীর্ত্তনীয়ারা যাঁহাদিগকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া থাকে, রায়শেখর ও শশিশেখর তাঁহাদের অন্যতম।

আমরা শশিশেখরের একটি পদ অবলম্বন করিয়া এই প্রসঙ্গ আরম্ভ করিব।

প্রথমেই কীর্ত্তনীয়া সখীগণপরিবৃতা রাধাকে মানের অবস্থায় শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে উপস্থিত করিল। কৃষ্ণ তাঁহার পদযুগল ধরিয়া আছেন। শুক-শারী বিবাদ করিতেছে; একজন কৃষ্ণ-পক্ষে, অপরে রাধা-পক্ষে। সখীরা ব্যধিকাকে গঞ্জনা করিয়া বলিতেছে, “শ্যামকে না দেখিলে মরবি, দেখিলেও মান করবি” এই রকমের উক্তি; কিন্তু চিত্রার্পিতা মূর্ত্তির ন্যায় রাধা বসিয়া আছেন, মুখে কোন কথা নাই। আপনারা বাজারে এই ভাবের অনেক চিত্র দেখিয়া থাকিবেন। এদিকে “চরণ-নথ রমণী-রঞ্জন ছাঁদ। ভূতলে লুটাইল গোকুলচাঁদ”—এই পদটি লইয়া অনেক টীকাকার ভুলের একটি দস্তুর-মত জাল তৈরী করিয়াছেন। বিদ্যাপতির একজন প্রসিদ্ধ ভক্ত ও টীকাকার লিখিয়াছেন “চরণনখর মণিরঞ্জন” অর্থ নখ-রঞ্জিনী বা নরুণ। কৃষ্ণ ও নরুণ, উভয়ের বর্ণই কালো, সুতরাং পদটির অর্থ হইল যে, গোকুলচন্দ্র কৃষ্ণ একটা

নরুণের মত ভূতলে পড়িয়া আছেন। এই উপমার আর একটি সার্থকতা এই যে, নরুণ দিয়া পায়ের নখ কাটা হয়। গোকুলচন্দ্রও রাধার পায়ের কাছেই পড়িয়া আছেন। বিদ্যাপতির মত এত বড় কবির তাঁহার একজন ভক্তের কৃত এরূপ নরসুন্দরী টীকার লাঞ্ছনা আমি কল্পনা করিতে পারিতাম না। পদটি কোন কোন সংস্করণে এইভাবে লিখিত হইয়াছে:—"চরণ-নখর-মণি-রঞ্জন ছাঁদ" এইভাবে লিখিত হইলে উহাকে টানিয়া বনিয়া কতকটা পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যার পরিপোষক করা যাইতে পারে; তথাপি "নখরঞ্জিনী" না হয় নরুণ হইল, কিন্তু "নখরমণিরঞ্জিনী" যে নরুণ হইবে, ইহাও নিতান্ত কষ্ট-কল্পনা না করিলে সিদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ মানুষের পায়ের নখকে নখর বলে না, বাঙালায় নখর বলিতে পশু-পক্ষীর নখ বুঝায়—মিথিলায় কি বুঝায় বলিতে পারি না। কিন্তু এই নরুণের উপমা অন্যদিক্ দিয়া সমর্থিত হইলেও, কবিত্বের দিক্ দিয়া উহা একবারে মারাত্মক। পদটী এইভাবে লিখিত হওয়া উচিত "চরণ-নখ রমণীরঞ্জন ছাঁদ" এবং ইহার অর্থ—এই যাহার পদনখের দ্যুতি, রমণীর মনোরঞ্জন করে, সেই শ্যামচন্দ্র রাধিকার পাদমূলে লুটাইয়া পড়িলেন। এই উক্তি-দ্বারা একদিকে শ্রীকৃষ্ণের রমণী-মন আকর্ষণ করিবার অসামান্য শক্তির ইঙ্গিত করা হইয়াছে, (সেই কৃষ্ণ যাঁহার পদ-নখ দ্যুতিতেই রমণী মুগ্ধ হয়), অপর দিকে তিনি রাধার পায়ের কাছে ভূতলে লুটাইয়া পড়িলেন—এই উক্তি দ্বারা তাঁহার গৌরবের সম্পূর্ণ ধ্বংস ও নতি স্বীকারের পরাকাষ্ঠা তুলনায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

মান শব্দটির প্রতিশব্দ আর কোন ভাষায় আছে কি না, জানি না। কোমল মনোভাব বুঝাইতে বাঙালীরা অনেকগুলি শব্দ সৃষ্টি করিয়াছে মানটি তাহাদের অন্যতম, ইংরেজীতে ইহার প্রতিশব্দ থাকা তো দূরের কথা, ইহার ভাবার্থ বুঝানও একরূপ অসম্ভব। ইহার অর্থ রাগ, ক্রোধ, গোস্মা বা খাপ্পা হওয়া নহে। এই সকল কাঠ-খোট্টা শব্দে মানের মাধুর্য্য বুঝান শক্ত। ইহা কৃত্রিম রাগও নহে; কারণ মূলে উপেক্ষার আঘাত আছে। ইহা প্রণয়ীর চিত্তের প্রেমের গভীরতা পরীক্ষা করিবার একটা কষ্ঠিপাথর; যিনি মান করেন, তিনি প্রেমিককে ছাড়িতে চাহেন না, বরং আরও কাছে আনিতে চাহেন—যদিও ইহা বাহ্যে কঠোর, ইহার ভিতরটা একবারে কুসুমকোমল। মানিনী যাহা চাহেন না বলেন, তাহাই আরও বেশী করিয়া চাহেন, অথচ মুখ মুখ ফুটিয়া কিছুতেই বলিবেন না—ইহা গভীর প্রেমের ছদ্মবেশ। এক বাঙালী কবি নিম্নলিখিত কয়েকটি ছত্রে মানের স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন

> "এক চক্ষু বলে আমি কৃষ্ণরূপ হেরব,
> অপর চক্ষু বলে আমি মুদিত হয়ে রব।
> এক পদ কৃষ্ণ-পাশে যাইবারে চায়,
> আর পদে বার বার বারণ করে তায়।"

যাহা হউক, এখন মানের মূল প্রসঙ্গে যাওয়া যা’ক। সখীরা রাধাকে নানারূপ মিষ্ট ভর্ৎসনা করিতেছে:

“ভাগে মিলল ইহ সময় বসন্ত,
ভাগে মিলল ইহ শ্যাম রসবন্ত!
ভাগে মিলল ইহ প্রেম-সঙ্ঘতি।
ভাগে মিলল ইহ সুখময় রাতি।
আজি যদি মানিনী তেজবি কান্ত,
জনম গোঙাঙিবী রোই একান্ত।”

ভাগ্যে এমন বসন্তকাল, এমন রসিক প্রেমিক, এমন বন্ধু ও এমন সুখময় রাত পাইয়াছ, আজি যদি এমন দিনে মান করিয়া কান্তকে ত্যাগ কর, তবে তোমার কাঁদিয়াই জীবন কাটাইতে হইবে। এখানে “সঙ্ঘতি” অর্থে বন্ধু (প্রেমিক)। পূর্ব্ববঙ্গে এখনও সাঙ্গাইত কথা প্রচলিত আছে। ইহার অর্থ প্রেমিক।

কৃষ্ণ পদ স্পর্শ করিয়া আছেন, সেই স্পর্শের গৌরবে রাধা আবিষ্ট হইয়া আছেন—তাঁহার বাহিরের জ্ঞান নাই। স্পর্শরসে তিনি আত্মহারা। হতাশ কৃষ্ণ এবার ফিরিয়া যাইতেছেন—রাধাকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিতে। কিন্তু একবার কতকটা যাইয়া ফিরিয়া চাহিতেছেন, রাধার মান ভাঙ্গিল কি না দেখিতে। এইভাবে পুনঃ পুনঃ থামিয়া থামিয়া কৃষ্ণ চলিয়া গেলেন।

কৃষ্ণের কোমল স্পর্শে আত্মহারা হইয়া রাধার মন বাস্তব জগতে জাগিয়া উঠিল, তখন মান আপনা হইতেই ভাঙ্গিয়া গেল এবং কৃষ্ণের জন্য মন হাহাকার করিয়া উঠিল। তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য রাধা সখীদের সাধিতে লাগিলেন। অনেক কথার কাটাকাটি হইল, সখীরা সময় পাইয়া বেশ দু’কথা শুনাইতে ছাড়িল না। রাধা বিলাপ করিয়া বলিলেন: “নারী জনমে হাম না করিলু ভাগী। এখন মরণ শরণ ভেল মানকি লাগি।” নারীজন্মে আমি কোন ভাগ্যই করি নাই, এখন মানের জন্য আমার মৃত্যুর শরণ লইতে হইল। কৃষ্ণকমল গেঁয়ো কথায় “আমি অতি পাষাণ-বুকী, সে মুখে হ’লাম বিমুখী–সে যে কেঁদে কেঁদে সেধে গেল গো” বলিয়া হৃদয়ের তীব্র ব্যথা বুঝাইয়াছেন; তাঁহার আর একটি পদ এইরূপ “আমি নহি প্রেমযোগ্য, করেছিলাম প্রেমযজ্ঞ, যোগ্যাযোগ্য বিচার না করে”——এই যজ্ঞের আমি যোগ্য নই, যজ্ঞেশ্বর কেন আমার যজ্ঞ গ্রহণ করিবেন?

রাধার এই মর্ম্মান্তিক কষ্টের এই দৃশ্য কি সখীরা সহিতে পারে? তাহারা তাঁহার আপনার, গালি দিয়াও তাহাদের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। বৃন্দা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কৃষ্ণের সন্ধানে চলিল। বৃন্দার সাশ্রু আঁখি বৃন্দারণ্যের সমস্ত স্থান খুজিতে লাগিল। কৃষ্ণ কোথাও নাই। ধীর মন্থর গতিতে বৃন্দা যাইতেছে, বংশীবট, যমুনাতট—যেখানে কৃষ্ণ রাধার প্রতীক্ষা করিয়া বাঁশীতে রাধাকে সঙ্কেত করেন, তিনি কোথাও নাই। নিশ্চয়ই রাধার নিষ্ঠুর ব্যবহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। বৃন্দার চক্ষের জল গণ্ডে গড়াইয়া পড়িতেছে, সে তাহা আঁচলে মুছিয়া আবার চলিতেছে। শ্যামকুণ্ড, মদনকুঞ্জ ও রাধাকুণ্ডের পার বৃন্দা বারংবার খুজিঁয়াছে। গোবর্দ্ধন পাহাড়ের উপত্যকা-পথে তন্ন তন্ন করিয়া তথাকার দ্বাদশ বনের প্রতিটি বন সন্ধান করিয়াছে। বড় আশা করিয়া বৃন্দা গোচারণের মাঠে ছুটিয়া গেল। হয়ত সেখানে কৃষ্ণ আছে। কারণ "সেও তে ধেনুর রাখাল বটে!" ধেনুর রব সখাদের কোলাহল শুনিয়া সে আশা করিয়াছিল, সেখানে হয়ত কৃষ্ণ আছেন, কিন্তু সেখানে শ্রীদাম, সুদাম ও মধুমঙ্গলাদি কৃষ্ণসখাদিগকে দেখিতে পাইল, আর দেখিতে পাইল বলরামকে, কিন্তু গোপীগণের নয়নাভিরাম কোথায়? বৃন্দা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। রাধা-কুণ্ডের পারে কৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখিয়া বুঝিল, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই অভিমানে সেই কুণ্ডে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন! তখন সে সেই পদচিহ্নের উপর লুটাইয়া পড়িল।

"জিতি কুঞ্জর, গতি মন্থর, চলল বর নারী,
বংশীবট যমুনাতট-বন সঘনে নেহারি।
শ্যামকুণ্ড, মদনকুঞ্জ রাধা-কুণ্ড-তীরে,
দ্বাদশ বন-হেরত সঘন শৈলহি কিনারে।
যাঁহা ধেনু সব করতহি রব,
তাঁহা চলতি জোরে,
(দেখে) শ্রীদাম, সুদাম, মধুমঙ্গল হেরত বল বীরে।"

এই নৈরাশ্যের অবস্থা অতিক্রম করিয়া বৃন্দা আবার ছুটিল, যে-পর্য্যন্ত আশার লেশ আছে—সে পর্য্যন্ত সে চেষ্টা ছাড়িবে না। রাধার কাছে সে মুখ দেখাইবে কিরূপে? তাহাকে কি বলিয়া বুঝাইবে? আজ যে মানের দায়ে তাহার প্রাণ যাইতে বসিয়াছে।

হঠাৎ যমুনাকূলে কদম্ববৃক্ষমূলে তাহার দৃষ্টি পড়িল, সেখানে সে হারাণো রতন কুড়াইয়া পাইল। কৃষ্ণের অবস্থা দেখিয়া এই দুঃখের মধ্যেও বৃন্দার হাসি পাইল। একদিকে বাঁশীটি পড়িয়া আছে—এত সাধের বাঁশী—সুখ-দুঃখের সঙ্গী বাঁশী কৃষ্ণের হস্ত-চ্যূত; কৃষ্ণ ধূলায় ধূসর, অপর দিকে, ময়ুরপুচ্ছের কত গৌরবের

চুড়াটি—তাহাও শির-চ্যুত, ধুলায় লুটাইতেছে। কৃষ্ণের কম্পিত ওষ্ঠ এই অবস্থায়ও “হা রাধে, হা রাধে” বলিতেছে, এত দুঃখেও কৃষ্ণ নাম ছাড়েন নাই, এ যুগে নাম সত্য,—সেই নাম ছাড়েন নাই। এদিকে তাঁহার হাতছাড়া বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে পবন হিল্লোলিত হইতেছে, ‘রাধানামে সাধা বাঁশী’ তখন আপনা হইতেই “জয় রাধে শ্রীরাধে” বলিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। কারণ বাঁশী আর কিছু জানে না। ওষ্ঠাধরের সেই অর্দ্ধস্ফুট রাধানাম ও বাঁশীর আকুল ‘রাধা রাধা’ ধ্বনি সেই নীপমূলে অদৃশ্য চিত্তহারী কল্পলোকের সৃষ্টি করিয়াছে। সেই কল্পলোকে উন্মত্তের ন্যায় পরিবেদনা বিমূঢ়, আর্ত্ত, ধূলিধূসর কৃষ্ণ পড়িয়া আছেন।

“যমনুকূলে, নীপহি মূলে, লুট বনওয়ারী,
শশিশেখর ধুলিধূসর, কহত প্যারী প্যারী।”

উপরে আমি এই পদটির যে বিবৃত্তি দিয়াছি, তাহার একটি কথাও আমার নিজের নহে, কীর্ত্তনীয়াদের আখর হইতে পাওয়া।

পরিহাস রস

গোপীরা কৃষ্ণকে লইয়া যে-সকল লীলা করিয়াছে, তাহা মাধুর্য্য-পূর্ণ হইলেও একঘেঁয়ে হয় নাই, মাঝে মাঝে পরিহাসের চাট্‌নি দিয়া তাহার আস্বাদ মুখরোচক করা হইয়াছে। সত্য বটে কৃষ্ণ রাধার পায়ে ধরিয়া সাধিয়াছেন। এতটা করার পর রাধার তাঁহাকে ক্ষমা করা উচিত ছিল, রাধা তাহা করেন নাই। এখন কৃষ্ণ-বিরহে রাধার প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে, বৃন্দা নিজেও অনেক ঘোরা-ফেরা করিয়া মনঃক্লেশ পাইয়াছেন। গোপীরা স্বভাবতঃই মুখরা ও পরিহাস-প্রিয়া; বৃন্দা এখানে একটা চাতুরী খেলিয়া কৃষ্ণ-কৃত তাহাদের এই কষ্টের প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছুক হইলেন। রাজকুমারী রাধার একটা মান-সম্ভ্রম আছে, সখীদের কাছে তাঁহার মান বজায় রাখিতে হইবে। এখন যদি সে হঠাৎ দেখা দেয়, তবে তিনি নিশ্চয়ই ভাবিবেন, রাধা তাঁহার বিরহে একান্ত অধীরা হইয়া তাঁহাকে খুজিবার জন্য বৃন্দাকে পাঠাইয়াছেন; কৃষ্ণের কাছে রাধাকে এতটা খেলো করিতে বৃন্দা রাজী নহেন। কৃষ্ণকে পাইয়া বৃন্দার দেহে প্রাণ আসিয়াছে, কিন্তু সে তাহার সামনে আনন্দ গোপন করিয়া ফেলিল। সে যেন কৃষ্ণকে দেখিতেই পায় নাই—এই ভাবে তাঁহার পাশ কাটিয়া হন্‌ হন্‌ করিয়া চলিয়া গেল। এদিকে কৃষ্ণ দূর হইতে বৃন্দাকে দেখিতে পাইয়া মনে করিলেন, নিশ্চয়ই মানভঙ্গের পর অনুতপ্তা হইয়া রাধা তাঁহার সন্ধানে দূতীকে পাঠাইয়াছেন, তখন হর্ষের উচ্ছ্বাসে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কৃষ্ণ গায়ের ধূলা ঝাড়িতে লাগিয়া গেলেন; অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত ময়ূরপুচ্ছের চূড়াটা মাথায় আঁটিয়া বাঁধিয়া, বাঁশী হাতে সাজগোজ করিয়া বৃন্দার আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন:—

কিন্তু একি? বৃন্দা তো তাহার কাছে আসিয়া থামিল না, বরঞ্চ যেন তাঁহাকে দেখিতেই পায় নাই, এইভাবে অতিবেগে তাঁহার পাশ কাটিয়া চলিয়া গেল! তখন হতবুদ্ধি হইয়া কৃষ্ণ পেছনে পেছনে 'দূতি দূতি' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।

''দূরে হেরি নাগর, চতুরা সহচরী
ঠমকি ঠমকি চলি যায়।
জনু আন কাজে, চলত বররঙ্গিনী
ডাহিনে-বামে নাহি চায়।
হরি হরি লুটায়ত কান, সহচরী গমন হেরইতে তৈখন,
হৃদয়ে করত অনুমান।
"কি এ অতি সদয়, হৃদয় ইহ মঝু পর,
সহচরী ভেজল কি রাই।

কি এ আন কাজে, চলত বর রঙ্গিনী,
কারণ পুছই বোলাই।
“সহচরি, সহচরি, সহচরি, করি হরি বেরিবেরি,
বহু বেরি করত ফুকার।
“চতুরিণী সহচরী ঝুঁকি কহত মধু,
নাম লেই কোন গোঙার।”
“চমকি কহত হরি হাম রাইকিঙ্কর
করুণা করিয়া অব আহ।
দাম মনোহর এক নিবেদন,
শুনি তবে আন কাজে যাহ।”

কৃষ্ণের ধূলিঝাড়া, ময়ূরপুচ্ছ-পরা প্রভৃতি সম্বন্ধে পদটি তালে গীত হইয়া থাকে। এই তাল অতি ত্রস্ত, কৃষ্ণের মনের ব্যস্ততার সঙ্গে উহার বেশ ঐক্য হয়।

বহু আহ্বানে বৃন্দা যে উত্তর দিল, তাহ মোটেই উৎসাহ-ব্যঞ্জক নহে। আমি কুলনারী, আমার পেছন-পেছন এমন করিয়া ডাকিতেছে কোন্ দুর্ব্বত্ত? “দুর্ব্বৃত্ত” কথাটি আমার। পদে “গোঙার” শব্দটি দেখিতেছেন। “গোঙার” শব্দটির আদি অর্থ “গোয়াল”। প্রাকৃত পিঙ্গলে “গোঙার” শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কালে এই শব্দ অর্থদুষ্ট হইয়াছে, ‘গোঁয়াড়’ বলিতে এখন আমরা দুর্ব্বৃত্ত বুঝি।

এই উত্তরে কৃষ্ণ একবারে মুসড়াইয়া পড়িলেন, তিনি বলিলেন—“আমি রাধার দাস, একবার করুণা করিয়া আমার একটি কথা শোন।” তখন বৃন্দা বলিতেছেন,

“কি কহবি রে মাধব তুরতহি কহ কহ
হাম যাওব আন কাজে।
তো সঞে বাত নহে মধু সমুচিত,
দোষ পাওব সখী মাঝে।”

বাহিরের লোকে নিন্দা করিবে, বৃন্দা একথা বলে নাই। গোপীরা বাহিরের লোকের নিন্দা-প্রশংসা এড়াইয়া গিয়াছে। বৃন্দা বলিতেছে, যে রাধার মনে কষ্ট দিয়াছে—তাহার সঙ্গে কথা বলিলে সখীরা আমাকে ক্ষমা করিবে না। কৃষ্ণ বলিতেছেন—

"কি কহব সজনি, কহিতে বা কিবা জানি,
রাই তেজল অভিমানী।
রাই তেজল বলি, তুহুঁ সব তেজবি,
তবে বিষ ভুঞ্জব আমি।"

বৃন্দার উত্তরে যেমনি শ্লেষ ফুটিয়াছে, তেমনই কৃষ্ণ চিরজীবী হইয়া বাঁচিয়া থাকুন, এই প্রার্থনা আছে। বলা বাহুল্য, এই প্রার্থনা গোপীর প্রাণের প্রার্থনা—আন্তরিকতাপূর্ণ।

"আহিরিণী কুরূপিনী, গুণহীনী, ভাগিহীনী—
তাহে লাগি কাহে বিষ পিঅবি?
চন্দ্রাবলী সঙ্গসুখ সুধারস,
পিবি পিবি যুগে যুগে জীরবি!"

এই গানগুলিতে ব্যঙ্গের আপাততঃ উপভোগ্য রস হইতে আর একটা রসের দিক্ আছে, তাহাতে শ্লেষের উপর খুব রং-চড়ান হইয়াছে। কৃষ্ণের ত্রস্ততার সহিত যোগ রাখিয়া প্রথম গানটির তাল দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বৃন্দার "কি কহবি রে মাধব" গানটির তাল, খুব বিলম্বিত, বৃন্দার ছলকরা ব্যস্ততার সহিত এই বিলম্বিত তালের একবারেই ঐক্য হয় না। তাহার কথাগুলি এত ধীর ছন্দে গীত হয়—যে, তাহাতে ত্রস্ততার চিহ্ন মাত্র নাই; "কি কহব—রে মাধব অ অ, তুরতহি কহ কহ—অ অ, হাম হাম যাওব আন কাজে—এ এ", এই একটি ছত্র গাহিতেই পুরো এক মিনিট সময় লাগিবে। এই বিলম্বিত ছন্দ দ্বারা কবি রহস্যের মাত্রা খুব বাড়াইয়াছেন; বৃন্দা বহু কষ্টে হারাণো ধন পাইয়াছেন, তাঁহাকে কি সহজে ছাড়িয়া দিতে পারে! সে মুখে ত্রস্ততার ভাণ করিতেছে, কিন্তু কণ্ঠের ছন্দে প্রতিবাদ করিতেছে।

বৃন্দা শেষে কৃষ্ণের অপরাধের কথা বলিল। কৃষ্ণ বহু সাধাসাধি করিয়াছেন—কিন্তু রাধা তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন, এই কথার উত্তরে সে বলিল।

"দুতি কহত তুয়া,
কৈছন পীরিতি রীতি বুঝই নাই পারি।
সো যদি মান ভরমে তোহে রোখল,
তুহুঁ কাহে আওড় ছোড়ি"—

তোমার প্রেমের রীতি, আমি বুঝি না, সে যদি ভ্রমেই মান করিয়া রাগ করিয়াছিল, তুমি তাকে ছাড়িয়া আসিলে কোন্ প্রাণে? বৃন্দা আরও বলিল, রাই প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, তোমার জন্য যে অপবাদ হইয়াছে—ইহা তাহারই প্রায়শ্চিত্ত, আমি ব্যবস্থার জন্য যাইতেছি, দেরি করিতে পারিব না। এ-কথা শুনিয়া কৃষ্ণের মুখখানি শুকাইয়া গেল। সহ্য করিবার সীমা আছে—কৃষ্ণের কষ্ট বৃন্দা আর সহিত পারিল না, এবার ভরসা দিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিল।

এই মান-লীলায়, তরল আমোদ-প্রমোদ, হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রুপের মধ্যে সুগভীর সরসী-নীরোদ্ভব প্রেমের ফুল্ল কমল ফুটিয়াছে, মানুষের মনে তিনি যে রস দিয়াছেন, তাহার মধ্যে তিনি আছেন। প্রেম-সরোবরে যে শতদল ফোটে, তাহার শোভার মধ্যে তিনি আছেন, শুক্তির মধ্যে মুক্তা খুঁজিবার জন্য এখানে ডুবারুকে হাতড়াইতে হয় না, পদাবলীর ভাণ্ডারে তাহা আপনিই হাতে আসিয়া পড়িবে।

সখীরা কৃষ্ণ-রাধার লীলায় সর্ব্বদা ইন্ধন জোগাইয়াছে, তাঁহাদের সাহচর্য্য ছাড়া হ্লাদিনী-শক্তির বিকাশ তেমন করিয়া দেখান যাইত না। গোবিন্দ দাস সখীদের কথা বলিয়াছেন-

> ‘‘প্রেম কারিগর মোরা যত সখীগণ।
> নিতি নিতি ভাঙ্গি-গড়ি পীরিতি-রতন।
> অন্তরে হাফরে মান অঙ্গারের খনি,
> বিরহ-অনলে তাহে ভেজাই আগুনি।
> সোণাতে সোহাগা দিয়া সোনাতে ভেজাই,
> রসের পাইন দিয়া ভাঙ্গিলে জোড়াই।’’

মান-মিলন

মান ও অভিসারের পর মিলন। শুধু দুঃখের কথা বলিয়া বৈষ্ণব কবিরা কোন কিছু পরিসমাপ্ত করেন না। শুভ-অশুভ দুইই সংসারে আছে, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আপাত সমস্ত অশুভের পরিণতি শুভে। শুধু মনে আঘাত দেওয়ার উৎকট আনন্দ দানব-প্রকৃতির উপযোগী। আমরা বিশ্ব-প্রকৃতির অভিপ্রায় বুঝি আর না, বুঝি, এটুকু বিশ্বাস করিতে হইবে যে, সকলই সেই মঙ্গলময়ের বিধান—সুতরাং শুভান্ত। মানের পর মিলন না হইলে মান অসম্পূর্ণ, মাথুরের পর ভাব-সম্মেলন না হইলে মাথুর অসম্পূর্ণ। আমরা সমস্ত পথটা দেখিতে পাই না, কিন্তু পৌছাইবার যে একটা স্থান আছে—তাহা অন্তরে বুঝি। বিয়োগান্ত কথায় লোক রাস্তার এমন একটা জায়গায় পড়িয়া থাকে, যাহাতে মনে হয় পথ ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু পথ ফুরাইলে হৃদয়ের হাহাকার থাকিয়া যায় কেন, গম্যস্থানে গেলে কি আর ক্ষোভের কারণ থাকিতে পারে? বিয়োগান্ত রীতিটা গ্রীকগণ পছন্দ করিয়াছেন, তাঁহারা অশ্রু ও দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া—ফাঁসীতে প্রিয়জনকে ঝুলাইয়া আসর ছাড়িয়া উঠিবেন। হিন্দুর প্রাণ এই অবিশ্বাস ও অসোয়াস্তির রাজ্যের কথা দিয়া যবনিকা-পতন ইচ্ছা করেন না।

তাঁহারা যদি দুঃখ বর্ণনা করিবেন, তবে তাহা কোন উন্নত আদর্শ লক্ষ্য করিয়া করেন। পিতৃসত্য রক্ষা করিবার জন্য রামের বনবাস, স্বামীপ্রেম দেখাইবার জন্য সাবিত্রী ও দময়ন্তীর কষ্ট বর্ণিত হইয়া থাকে। কিন্তু রাজকুমার শিশু-আর্থারের চক্ষু উৎপাটন বা শেষাঙ্কে হ্যামলেট-কর্ত্তৃক অকারন কতকগুলি মানুষ হত্যা—এই সকল বৃথা কষ্টের অবতারণা করিয়া শ্রোতার হৃদয়ে অহেতুক ব্যথা দেওয়া সংস্কৃতের আলঙ্কারিকগণ নিষেধ করিয়াছেন।

অভিসার ও মানের পর কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। অভিসারে রাধা "দুই সখীর কাঁধে দুই ভুজ আরোপিয়া, বৃন্দাবনে প্রবেশিল শ্যাম-জয় দিয়া"—"বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া ধনী ইতি-উতি চায়, মাধবী তরুর মূলে দেখে শ্যাম রায়,"—গায়েন বলিতেছে, শ্যাম ধ্যান-ধরা যোগীর মত দাঁড়িয়ে আছে। তপ-সিদ্ধির প্রাক্কালে যোগী যেরূপ ধ্যানস্থ হইয়া আনন্দময়ের উপলদ্ধির পরীক্ষায় দাঁড়ায়—ইহা সেইরূপ ধ্যানের প্রতীক্ষা।

"ধেয়ে গিয়ে শ্যামচাঁদ রাইকে ধরে কারে,
ললিতা দাঁড়িয়ে হাসে কুঞ্জলতার আঁড়ে।"

কুঞ্জলতার ঘন অথচ তরল পত্রান্তরাল হইতে ললিতার দুটি সকৌতুক চক্ষু যুগল-মিলনের এই দৃশ্য দেখিতেছিল।

“(তখন) শির হইতে গুঞ্জা ফল তুলি শ্যাম রায়,
নমো প্রেমময়ী বলিয়া দিলা রাধার পায়।”
এবং “খুলিয়া চাঁপার মালা এলায়ে কবরী,
বধুঁর যুগল পদ বাঁধেন কিশোরী।”

এই যুগল-মিলনে দেব-দেবী উভয়ে উভয়ের পূজা করিতেছেন। দেহের চাঞ্চল্যের উর্দ্ধে—ভোগলালসার দুর্নীত হাওয়া যেখানে পৌঁছিতে পারে না, সেই অম্লান অধ্যাত্ম কুঞ্জবনে–ইঁহাদের লীলা, এবং ইহাই উচ্চাঙ্গের ভক্তের নিত্য বৃন্দাবন। ইন্দ্রিয় প্রশমিত না হইলে, দৈহিক কামনা একেবারে পুড়িয়া ছাই না হইয়া গেল কেহ বৃন্দাবনের কিশোর-কিশোরীর প্রেম বুঝিতে পারিবেন না, কবিরাজ ঠাকুর এই প্রেমকে “নির্ম্মল ভাস্কর” এবং লালসাকে “অন্ধ তম” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (“কাম অন্ধ তম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর”)।

এই মিলনের চিত্র নানা কবি নানা ভাবে আঁকিয়াছেন; একজন লিখিয়াছেন:—

“মোহন বিজন বনে, দূর গেল সখীগনে–
একেলি রহল ধনি রাই।
দুটি আঁখি ছল ছল, চরণ কমলতল
কানু আসি পড়ল লুটাই।
কমলিনী জীবন সফল ভেল মোর,
তোমা হেন গুণনিধি, পথে আনি দিল বিধি,
আজিকে সুখের নাহি ওর।”

যে দেশে শীতে জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়, সেখানকার হাওয়া বাঙালা দেশে আসিয়া লাগাতে অশ্রু শুকাইয়া গিয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে এখন চক্ষের জলের মূল্য স্বীকার করেন না। প্রেম-স্নেহ প্রভৃতি কোমল ভাবের সর্ব্বপ্রধান নিদর্শন এই অশ্রুর মূল্য স্বীকার করিতে হইলে নিগৃহীত পিতামাতার ও উপেক্ষিতা স্ত্রীর ঋণ স্বীকার করিতে হয়, শিক্ষিত সংজ্ঞায় অভিহিত দুর্নীত পুত্র ও স্বামীর তাহা হইলে খামখেয়ালী করায় বাঁধা জন্মে। অন্য দেশের কি তাহা জানি না, কিন্তু এই অশ্রুই বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্। চৈতন্য বক্তৃতা করেন নাই—উপদেশ

দেন নাই—ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই। তিনি চোখের জল দিয়া সমস্ত দেশটা বিজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার একবিন্দু অশ্রুতে যে প্লাবন আনাইয়াছিল, তাহা এখনও সমস্ত নগর ও পল্লী ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। বড় ব্যথা—বড় আনন্দের ক্ষেত্রে এই অশ্রুর জন্ম, ইহা এখন Sentimentalism-এর লক্ষণ বলিয়া যাঁহারা অগ্রাহ্য করিতে চান, তাঁহাদের মত কাটখোট্টা পণ্ডিত ইতিপূর্ব্বেও এদেশে অনেক ছিল। পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে একদা শ্রীবাস গীতার আলোচনা-সভায় কাঁদিতেছিলেন, এইজন্য সে-সভার পণ্ডিতেরা তাঁহাকে গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল এবং স্বয়ং চৈতন্যদেবও বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট "ভাবুক" বলিয়া ভর্ৎসিত হইয়াছিলেন ও কাশীর প্রকাশানন্দ স্বামীও চৈতন্যকে ইহার জন্য নিন্দা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমস্ত পণ্ডিতকে মূঢ় প্রতিপন্ন করিয়া চৈতন্যের দুইটি চক্ষুর মুক্তাসম অশ্রু কোটী কোটী লোকের মহাশাস্ত্র হইয়া আছে। এই পরমানন্দজ অশ্রুর কথাই কবি এখানে বলিতেছেন—

"দুটি আঁখি ছল ছল, চরণ-কমলতল,
কানু আসি পড়ল লুটাই।"

আর এক কবি এই মিলনকালে বলিতেছেন, "আদরেতে আগুসারি, রাইকে হৃদয়ে ধরি"—কৃষ্ণ জানুর উপরে রাধার পা দু'খানি রাখিয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া আছেন, "নিজ কর-কমলে চরণযুগ মুছই, হেরই চির থির আঁখি।" রাধার পা দু'খানি দেখিয়া কৃষ্ণের চোখের তৃষ্ণা মিটিতেছে না, "এ ভর দুপুর বেলা, তাতিল পথের ধুলা, কমল তিহনিয়া পদ তোর," পথে কোথায় কাঁটা পায়ে ফুটিয়াছে, দেখিতে যাইয়া কৃষ্ণ অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেছেন না এবং "পুছই পহু কি দুখ"—পথে কি কি কষ্ট পাইয়াছেন, অতি আদরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

রাধা ও কৃষ্ণ উভয়েরই পরস্পরের পদের দিকে দৃষ্টি—ইহাতে প্রমাণ হয়, এ প্রেমের জন্ম পূজার ঘরে। কবি কৃষ্ণকমল বলিয়াছেন—

"অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি,
আলতা পরাত বঁধু কতই বাখানি।"

এই চরণ-পদ্মের শোভা এখনকার উচ্চ-গোড়ালী, খুরওয়ালা জুতার দিনে আমরা এ-যুগের তরুণদের কি করিয়া বুঝাইব? রবীন্দ্র বাবুর পরে আর কেহ রমণী-চরণের সৌন্দর্য্য বর্ণন করেন নাই।

এই মিলন-দৃশ্যে রাধা-কৃষ্ণের গীতিকা অপূর্ব্ব আনন্দের ছবি অঙ্কিত করিয়াছে। পদ-সাহিত্যের কৌস্তুভমণি "জনম অবধি" এই পদটী মিলনের গীতি।

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিলু—
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোহি মধুর বোল শ্রবণে হি শুনিলু,
শ্রুতিপথে প্রবেশ না গেল।
কত মধু যামিনী—রভসে গোয়াইলু,
না বুঝিলু কৈছন কেলি,
লাখ লাখ যুগ হিরে হিয়া রাখিলু
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।"

এই গানটি সর্ব্বত্রই কবি-বল্লভের ভণিতায় পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানে নাকি অন্য গানে বিদ্যাপতির কবি-বল্লভ উপাধি পাওয়া গিয়াছে—যাহা হউক তাহাতে সন্দেহের কারণ আছে। বিচারপতি সারদাচরণ যখন বিদ্যাপতির সংস্করণ প্রকাশ করেন, তখন তিনি এই সূত্রে "কবিবল্লভ" অর্থে বিদ্যাপতি বুঝিয়াছিলেন; অক্ষয় সরকার মহাশয় নির্ব্বিচারে সারদাচরণকেই অবলম্বন করিয়া পদটি বিদ্যাপতির খাতায় লিখিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্যাপতির যদিই বা "কবিবল্লভ" উপাধি থাকিয়া থাকে, তবে, যাহার উপাধি "কবিবল্লভ" তিনিই যে বিদ্যাপতি হইবেন—তাহা নহে। তারপর "বিদ্যাসাগর" বলিতে যেরূপ ঈশ্বরচন্দ্রকেই বুঝায়, "কবিবল্লভ" উপাধি সম্বন্ধে বিদ্যাপতির সেরূপ কোন যোগরূঢ়ত্ব হয় নাই। যদিই বা স্বীকার করা যায় যে, বিদ্যাপতির "কবিবল্লভ" উপাধি ছিল, তাহার এই উপাধি জনসমাজে কতকটা অবিদিত ছিল। বরঞ্চ "নব জয়দেব", "কবিরঞ্জন"—এই দুটিই ছিল তাঁহার উল্লেখযোগ্য উপাধি।

'বিদ্যাসাগর' উপাধিতে ঈশ্বরচন্দ্র বুঝাইলেও, উহাতে তাঁহার একচেটিয়া সত্ব জন্মিয়াছে, একথা স্বীকার করা যায় না। বঙ্গের কয়েক জন বিশিষ্ট লোক ঈশ্বরচন্দ্রের সময়েই "বিদ্যাসাগর" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ক্ষুদ্র পরিবেষ্টনীয় মধ্যে 'বিদ্যাসাগর' বলিলে তাঁহাদিগকে বুঝাইত, যথা ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ এবং বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থের টীকাকার ও সম্পাদক জীবানন্দ। এদেশে পল্লী খুঁজিলে আরও বিদ্যাসাগর মিলিতে পারে, সুতরাং "কবিবল্লভ" বলিতে যে শুধু বিদ্যাপতিকেই বুঝাইবে, এ-কথা একেবারেই বলা চলে না। 'কবিবল্লভ' উপাধি বিদ্যাপতির আদৌ ছিল কিনা—তাহারই নিশ্চয়তা নাই। এই উপাধিটি বাঙালা দেশেরই উপাধি বলিয়া মনে হয়, মিথিলায় ইহার তাদৃশ প্রচলন ছিল কিনা সন্দেহ। 'কবিবল্লভ' বলিতে এদেশে কিংবা মিথিলায় পূর্ব্বে কখনও

বিদ্যাপতিকে বুঝাইত না। তবে আমাদের দেশে যাঁহারা কোন প্রাচীন কাব্য সম্পাদন করেন, তাঁহারা বিচারবুদ্ধি তাদৃশ ব্যবহার করেন না—যতটা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ব্যগ্র হন। সুতরাং যদি পূর্ব্বের কোনো সংস্করণে ভুলক্রমে কোন সম্পাদক কোন পদ কবি-বিশেষের খাতায় লিখিয়া ফেলেন, পরবর্ত্তী কবিরা কিছুতেই তাহা বাদ দিতে স্বীকৃত হন না, পাছে পূর্ব্ব সংস্করণ ছোট হইয়া যায়। এই ভাবে গতানুগতিকদের প্রসাদে কবিবল্লভ উপাধিক বাঙালী-কবির পদটি মিথিলার বিদ্যাপতির খাতায় উঠিয়াছে। বিদ্যাপতির মত শ্রেষ্ঠ কবির মর্য্যাদা এই একটি পদে বাড়ে নাই, কিন্তু কবিবল্লভ নামক বাঙালী-কবি এই পদটি হারাইয়া হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন। শুধু কবিবল্লভ নহে, রায়শেখর এবং অন্যান্য কয়েক জন বাঙালী কবিকে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতির নামে চালাইয়াছেন। যখন তিনি মিথিলায় বিদ্যাপতির পদ-সংগ্রহ করেন, তখন একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন, মিথিলার কোন পুঁথিতেই তিনি “জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু” পদটি পান নাই, অথচ বিদ্যাপতির ভক্ত টীকাকার তাঁহার সংস্করণে পূর্ব্ববর্ত্তী সম্পাদকদের অনুসরণ করিয়া বিদ্যাপতির পদ বলিয়াই উহা চালাইয়াছেন। যিনি বঙ্গের বৈষ্ণবকবিকুলচূড়ামণি গোবিন্দ দাসকে অজ্ঞাতনামা মৈথিল কবি গোবিন্দ দাস ভ্রম করিয়া তাঁহার সমস্তগুলি উৎকৃষ্ট পদ মিথিলায় সংগ্রহ-পুস্তকে সঙ্কলিত করিবার প্রেরণা দিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কবিবল্লভ ও রায়শেখরকে এইভাবে বিদ্যাপতির পদাবলীতে স্থান দেওয়ায় আমরা দুঃখিত হইয়াছি, কিন্তু আশ্চর্য্য হই নাই। বর্ত্তমান দ্বারবঙ্গাধিপ সেই অজ্ঞাতনাম মৈথিল-কবি গোবিন্দ দাসের বংশধর, সুতরাং এই সকল কার্য্যে রাজ-মনস্তুষ্টি ও মিথিলাবাসীদের প্রীতি সাধিত হইয়াছে; সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত এবং সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় এম-এ, নগেন্দ্রবাবুর এই কার্য্যের বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছেন, আমি এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে, যখন তিনি বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ করেন, তখন সম্ভবতঃ তিনি জানিতেন না, বাঙালী বহু বৈষ্ণব কবি মৈথিলভাষার ছন্দে ব্রজবুলিতে পদ লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ব্রজবুলি পাইলেই তাহা মৈথিল-পদ মনে করিয়া যাহা কিছু হাতের কাছে পাইয়াচেন—তাহাই বিদ্যাপতির রচনা মনে করিয়াছিলেন। তাহার পর যখন জানিতে পারিলেন যে, বাঙালী কবিদের এক বিরাট্ ব্রজবুলি-সাহিত্য আছে, তখন পূর্ব্বকৃত কার্য্যের সমর্থনের জন্য ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া তৎসঙ্কলিত পদগুলি যে মৈথিলী-ব্রজবুলী নহে—তাহাই প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু একথা নিশ্চিত নহে যে, ব্রজবুলী ও মৈথিলীর সুক্ষ্মতার তারতম্য করিতে পারেন, এরূপ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত অল্পই আছেন। নগেন্দ্রবাবু আদৌ ভাষাবিৎ নহেন, যেক্ষেত্রে তাঁহার বর্ণপরিচয় পর্য্যন্ত হয় নাই, সেখানে তাঁহার বিচার কেহ মানিয়া লইবে না। পূর্ব্বভারতীয় ভাষাগত নানা সূক্ষ্ম বিভিন্নতা বুঝিতে স্বয়ং গ্রিয়ারসন সাহেব ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; অপরের কি কথা!

শুধু এই পদটি ও রায়শেখরের পদগুলি নহে, কত বাঙালা পদ যে বিদ্যাপতির উপর আরোপ করা হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। "মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব, কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব"—গানটি, যাহার অস্থি, পঞ্জর, ত্বক, মাংস সমস্তই বাঙালার মাটী ও বাতাসের উপাদানে গড়া—তাহা কেন যে বিদ্যাপতির ঘাড়ে চাপানো হইয়াছে, তাহা একটা সমস্যা। এই গানটির ভাব সুপ্রাচীন কাল হইতে বাঙালার হাওয়ায় ঘুরিতেছে। মিথিলার সঙ্গে ইহার কোনই সম্পর্ক নাই। আমি ত্রিপুরার জঙ্গলে গ্রাম্য কৃষকের মুখে ভাটিয়াল সুরে এই গানের মর্ম্ম শুনিয়াছি—"আমি মৈলে এই করিও, না পেড়োয়ো না ভাসায়ো", অন্যান্য বহু বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবির কণ্ঠে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে মনোহরসাই রাগিণীতে এই গীতি শোনা গিয়াছে। "আমার নীরে নাহি ডারবি, অনলে নাহি পোড়াবি" কিম্বা "দেহ দাহন ক'র না দহন দাহে, ভাসায়ো না তাহা যমুনা প্রবাহে" এবং "প্রাণ যদি দেহ ছাড়া, না দ'হ বহ্নিতে মোরে না ভাসায়ো যমুনা সলিলে" প্রভৃতি বহু পদে, বাঙালার প্রতি কোণে কোণে শত শত নরনারী-কণ্ঠে যে-কথা বহুকাল হইতে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে, বাঙালা দেশের সেই মর্ম্মোক্তি, বাঙালা ভাষায় রচিত। বাঙালা ছন্দে গ্রথিত সেই গানটি কেন যে বিদ্যাপতির পদাবলীর মধ্যে আসন পাইল এবং সুবিজ্ঞ সম্পদকেরাই বা কেন এই অনধিকার-প্রবেশ সম্বন্ধে চুপ করিয়া রহিলেন, তাহা তাঁহারাই জানেন! এইরূপ আরও অনেক বাহিরের পদ বিদ্যাপতির পদ-সংগ্রহে ঢুকিয়া বইখানি ধাউসের মত বৃহদাকৃতি করিয়া তুলিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্থলে আরও কয়েকটি পদের প্রথম দুই এক ছত্র উল্লেখ করিতেছি—সেগুলি নিছক বাঙ্গালা পদ—"আজি কেন তোমায় এমন দেখি, সঘনে ঘুরিছে অরুণ আঁখি"—"শুনলো রাজার ঝি তোরে কহিতে আসিয়াছি, কানু হেন ধন, পরাণে বধিলি, এ কাজ করিলি কি?"

মিলনের দৃশ্য আরও অনেক কবি দেখাইয়াছেন, তাহাদের কোন কোনটিতে অধ্যাত্মরাজ্যের ছায়া পড়িয়াছে। "আজি নিধুবনে শ্যাম-বিনোদিনী ভোর, দোঁহার রূপের নাহিক উপমা, সুখের নাহিক ওর" পদটি দৃষ্টান্ত-স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে। এই জগতে একদিকে ঘননীল বনান্ত ও সুনীল নভস্তল, অপরদিকে সোনালী রৌদ্র ঝক্ ঝক্ করিতেছে। এই বিশ্বপ্রকৃতির রূপ লইয়া যুগলমূর্ত্তি সখিদিগের মন মুগ্ধ করিতেছে—

"আজি হিরণ-কিরণ, আধ-বরণ আধ-নীলমণি জ্যোতি,
আধ-গলে বনমালা বিরাজিত, আধ-গলে গজমতি,
আধ-শিরে শোভে ময়ুর-শিখণ্ড, আধ-শিরে দোলে বেণী,
কনক-কমল করে ঝলমল ফণী উগারয়ে মণি,
আধই শ্রবণে মকর-কুণ্ডল, আধ রতন ছবি,
আধ-কপালে চাঁদের উদয়, আধ-কপালে রবি।

মন্দ পবন মলয় শীতল তাহে শ্রীঅঙ্গের বাস!
রসের সায়রে না জানি সাঁতার ডুবিল অনন্ত দাস।”

হেম-কান্তি ও নীলকান্তিতে, ময়ূরপুচ্ছ ও বেণীর লহরে আধ সিন্দূর বিন্দুর সঙ্গে আধ-কপালের চন্দনবিন্দুতে গজমতি হার ও বনমালায়—চিরপিপাসিত বহু কৃচ্ছ্র উত্তীর্ণ প্রকৃতি-পুরুষের আনন্দময় মিলন—এই চিত্র দেখিয়া কবি ভুলিয়া গিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন, এ রস-সৌন্দর্য্য সমুদ্র পার হইবার সাধ্য তাঁহার নাই—কারণ তিনি সাঁতার জানেন না, এই জন্য ডুবিয়া গেলেন। এই চিত্র কি? মন্দিরে মন্দিরে আরতিকালে ধূপধূমচ্ছায়ার মন্দীভূত পঞ্চপ্রদীপের আলোকে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি লক্ষ্য করুন, তারপর বাহিরে চাহিয়া রৌদ্রকরোজ্জ্বল গগনে বনাস্তবীথিকার শিশিরবিন্দুতে ও নীলিম পল্লবে সেই মূর্ত্তির প্রভা দেখিতে পাইবেন। এই জগৎ সেই আনন্দময় প্রকৃতি-পুরুষের মিলন-দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতেছে। ইহা এ-পার ও পরপারের কথা একসঙ্গে মনে জাগাইবে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈষ্ণব কবিরা সাধারণের নিকট তাঁহাদের কাব্য এক হইতে দেন নাই; কেবলই মিষ্টরসে রসনায় জড়তা আসে—কেবলই সন্দেশ খাওয়া যায় না, মাঝে মাঝে মুখরোচক কিছু দিয়া স্বাদ বদলাইতে হয়। পরিহাস-রসের দৃষ্টান্ত আমরা মান-মিলন উপলক্ষে দেখাইয়াছি। ইহা ছাড়া আরও কোন কোন স্থানে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সেই সেই অংশে আমরা যেন হঠাৎ স্বর্গরাজ্য হইতে বাস্তবরাজ্যে পড়িয়া যাই। যাত্রা ও কীর্ত্তনে এই পরিহাস-রসিকতা অতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া শ্রোতার মনোরঞ্জন করে। কিন্তু পাঠকেরা মনে করিবেন না, এই রসের বাহ্যিক তারল্য বৈষ্ণব আদর্শকে কোন স্থানে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, এই রস ইতর লোকের তাড়ি নহে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের টেবিলের বাহ্যিক রুচিসঙ্গত ‘বিয়ার’ নহে—ইহা ঘন খর্জ্জুর রস। ইহার জন্ম মাতালের বাহবা-দেওয়া ঘন করতালির মধ্যে নহে—ইহার জন্ম অসাধারণ তপস্যা ও কৃচ্ছ্রের মধ্যে—বিদীর্ণ ও কর্ত্তিত হৃদয়ের মধ্যে হইতে বাহির হয়, এই হাস্য-রস উপভোগের সময় মাঝে মাঝে চোখে জল আসে, কারণ হাসি হইলেও ইহা বড় কষ্টের হাসি।

মান-মিলনের পূর্ব্বে হাস্যরসের দ্বিতীয় অবকাশ খণ্ডিতা। রাধিকা বুঝিয়াছেন, কৃষ্ণ সমস্ত জগতের—তাঁহার একার নহেন। তিনি তাঁহাকে শুধু রাধা নামের ছাপ দিয়া ধরিয়া রাখিবেন কিরূপে? এই সন্দেহে সারারাত্রি প্রতীক্ষায় কাটাইয়াছেন, তাঁহার বকুলমালার ফুলগুলি বাসি হইয়া গিয়াছে। বেণী শিথিল হইয়াছে, দুরন্ত সূর্য্যের আলো যেরূপ পশ্চিম গগনে মিশিয়া যায়, তাঁহার অধরপ্রান্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রভাতে কৃষ্ণ আসিয়াছেন, বড় কষ্টের মধ্যে সখীরা তাঁহাকে পরিহাস করিতেছে:—

"ভাল হৈল ওরে বঁধু আইলে সকালো,
প্রভাতে দেখিলাম মুখ দিন যাবে ভালো।"

বহু বৎসর পূর্ব্বে একদা শিবু কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীতে কীর্ত্তন গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিয়াছিল। পূর্ব্বরাগ, মাথুর, গোষ্ঠ প্রভৃতি নানা পালা গাহিবার পরে, একটি নূতন পালা গাওয়া হইবে। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও ঠাকুর-পরিবারের অপরাপর প্রায় সমস্ত ব্যক্তিই প্রত্যহ আসরে উপস্থিত থাকিতেন। অপরদিকে সেই পরিবারের মহিলারাও গান শুনিতে আসিতেন। রবীন্দ্রনাথই শিবুকে আনাইয়াছিলেন। মাথুর গাইয়া শিবু শ্রোতৃবর্গকে অশ্রুর বন্যায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধ দ্বিজেন্দ্রনাথই শ্রোতাদের মধ্যে বেশী কাঁদিতেন। ছেলেদের গৃহ-শিক্ষক জার্ম্মান্ Lawrence সাহেব কথাগুলি না বুঝিয়াও শিবুকৃত এই অপূর্ব্ব উদ্মাদনার প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইতেন, তিনি চুপ করিয়া আসরের একটি কোণে বসিয়া থাকিতেন। একদিন রবীন্দ্রনাথ প্রাতে শিবুকে বলিলেন, "কীর্ত্তন তো বেশ গাহিতেছ, আজ সন্ধ্যায় কি গাহিবে?" শিবু বলিল, "খণ্ডিতা"। রবীন্দ্রনাথ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "শিবু এইবার দেখ্‌ছি মজালে! আমাদের বাড়ীর মহিলাদের সম্মুখে তুমি "খণ্ডিতা" গাইবে? এইবার তোমার অর্জ্জিত যশ পণ্ড হবে। ব্রাহ্ম মেয়েদের রুচি তুমি জান না—ইহাদের কাছে তুমি খণ্ডিতার পালা গাইবে কোন্ সাহসে?" শিবু জোড়হাতে করিয়া বলিল, "হুজুর, আমরা যে-জিনিষটা যে-ভাবে দেখি, আপনারা সে-ভাবে দেখেন না। আমাদের কাছে রাধাকৃষ্ণের লীলা পবিত্র, ইহাতে পাপ আসবে কিরূপে? আপনি আসরে এসে দেখবেন, কোন অসঙ্গত ভাব বা ভাষা আমার মুখ হতে বাহির হবে না।"

সন্ধ্যায় আমরা আসরে আসিয়া বসিলাম। গৌরচন্দ্রিকা গাওয়ার পরে শিবু যে গানটি প্রথম গাহিল, তাহা আমার মনে নাই, কিন্তু তাহার মর্ম্ম এই—"ভগবান পাপী-তাপী কাহাকেও ছাড়িতে পারেন না, তিনি সকল দুয়ারেই প্রেমভিক্ষা করিয়া বেড়ান, পাপী তাঁহাকে কষ্ট দেয়, তাঁহাকে ক্ষত-বিক্ষত করে। প্রেমিক তাঁহার এই আচরণে ব্যথিত হন।" এই গানটি অতি করুণ ও গদ্‌গদ কণ্ঠে সে গাহিয়া আসরে এমন একটি নির্ম্মল হাওয়ার সৃষ্টি করিল, যাহার পরে চন্দ্রাবতীকৃত অত্যাচারের কথা শ্রোতারা ভাবের সেই উচ্চগ্রাম হইতে শুনিল, কোন অশিষ্টভাব মনে হওয়া তো দূরের কথা—ভক্তির বন্যায় আসর ভাসিয়া গেল। শ্রোতারা নির্ব্বিকারচিত্তে শুনিতে লাগিল—"আহা বঁধু শুকায়েছে মুখ। কে সাজাল হেন সাজে হেরি বাসি দুখ।"

বস্তুতঃ বাঙালার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কত যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা—ভক্তি ও প্রেমের গভীর জ্ঞান লুক্কায়িত আছে, তাহা কেমন করিয়া বুঝাইব? তাহাদের

অসাধারণ ভক্তি-গঙ্গা-স্রোতে শ্লীল-অশ্লীল বহুমূল্য পণ্য-বোঝাই ডিঙ্গি ও গলিত শব একটানে ভাসিয়া যায়—প্রেমের সাগর-সঙ্গমে। সেই গঙ্গার পাবনী স্পর্শে পবিত্র ও অপবিত্রের মধ্যে ব্যবচ্ছেদ রেখা মুছিয়া যায়—সকলই দেবতার আশীর্ব্বাদ বহন করে।

গোপীদের এই উপলক্ষে পরিহাস-সূচক অনেক পদ চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন:—

“নয়নের কাজর, বয়ানে লেগেছে,
কালোর উপরে কালো।
প্রভাতে উঠিয়া, ও মুখ দেখিলু,
দিন যাবে আজি ভালো।
অধরের তাম্বুল, নয়নে লেগেছে,
ঘুমে ঢুলু ঢুলু আঁখি;
আমা পানে চাও, ফিরিয়া দাঁড়াও,
নয়ন ভরিয়া দেখি।
চাঁচর কেশের চিকুর বেণী
সে কেন বুকের মাঝে।
সিন্দুরের দাগ, আছে সর্ব্ব গায়
মোরা হৈলে মরি লাজে।” ইত্যাদি—

মান কীর্ত্তনীয়ারা আসরে গায় না—কারণ ইহার প্রতিটি ছত্রে যে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে, তাহা শীলতার হানিকর। কিন্তু যাঁহারা ভাগবানের চরণে সমর্পিতপ্রাণ রসিক ভক্ত, তাঁহারা গোপীদের মনোবেদনাপূর্ণ শ্লেষের ভাষার মধ্যে করুণাময়ের প্রতি ব্যথিত চিত্তের অশ্রুভারাক্রান্ত নিবেদনের ভাব উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

সেকালের রুচি আর একালের রুচির লক্ষ্য পৃথক। এখনকার লোকেরা জগতের অদ্বৈতরূপ দেখিতে পান না। ভাল-মন্দ, পবিত্র-অপবিত্র, ভষ্ম-চন্দন প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপিয়া যাঁহার সত্বা, তাঁহাকে তাঁহারা পোষাকী করিয়া মন্দির মধ্যে—জগৎ হইতে স্বতন্ত্র স্থানে তুলিয়া রাখিতে চান; প্রাচীনেরা তাঁহাদের সমস্ত ক্রিয়া কর্ম্ম, লীলা খেলারও মধ্যে তাঁহাকে না পাইলে তৃপ্ত হইতেন না। যাঁহাকে তাঁহারা পূজার ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাকে তাঁহারা খেলার ঘরে আনিতেও দ্বিধা বোধ করিতেন না। সমস্ত দেহ ও সর্ব্বেন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা তাঁহাকে সেবা করা—এই ছিল তাঁহাদের ভাবধারা। ভক্তি-ভস্ম গায় মাখিয়া তাঁহারা প্রেম-মধুচক্রে প্রবেশ করিতেন, তখন তাঁহারা ইন্দ্রিয়-মক্ষিকার দংশনের অতীত হইয়া

থাকিতেন। কোন একটি ভাল কীর্ত্তনের আসরে ভক্তের কণ্ঠে কীর্ত্তন শুনিলে, আমি যাহা বুঝাইতে এত কথা বলিলাম, তাহা পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। আমি সেই ভক্তির কণা কোথায় পাইব, যাহার বন্যাস্রোতে মহাপ্রভু এদেশের নিম্নশ্রেণীকে মাতাইয়াছিলেন! পণ্ডিতেরা সেই ভক্তির অমৃতভাণ্ড ফেলিয়া দিয়াছেন, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এখনও সেই প্রসাদ কুড়াইয়া রাখিয়া দিয়াছে।

এদেশের কীর্ত্তনের একটা বিশেষ মূল্য আছে। গণিকারাও কীর্ত্তন গাহিয়া থাকে। তাহাদিগকে ব্রহ্মসংগীত, রামপ্রসাদ ও দাশরথীর গান, বাউল সংগীত, টপ্পা, খেয়াল, গোপাল উড়ের গান, নিধুবাবুর গান প্রভৃতি যাহা কিছু গাহিতে বলা যায়, তাহাই গাহিবে। কীর্ত্তন গাহিতে হইলে বলিবে, “স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া আসি”; শুদ্ধা, স্নাতা না হইয়া তাহারা কীর্ত্তন গায় না। কীর্ত্তন সম্বন্ধে এদেশের জন-সাধারণের কিরূপ উচ্চ ধারণা, তাহা ইহা হইতে বুঝা যায়।

কৃষ্ণ গোপীদের শ্লেষের উত্তরে অনেক উপদেশ দিয়াছেন, গোপীরা বলিতেছে—

“ভাল ভাল ভাল, কালিয়া নাগর, শুনালে ধরম কথা,
সরলা-বালিকা ছলিলে যখন, ধরম আছিল কোথা?
চলিবার তরে কর উপদেশ পাথর চাপিয়া পিঠে,
বুকেতে মারিয়া ছুরির ঘা, তাহাতে নুনের ছিটে।”

—সেই ভবঘুরে কৃষ্ণের জগতে কোথায় গতিবিধি নাই? ধর্ম্মযাজকের ভজন-মন্দির ও মাতালের আড্ডা—সর্ব্বত্র তাঁহার অবাধ গতি। এজন্য গোপী বলিতেছে—

“সোনা, রূপা, কাঁসা চোর কি বাছে,
চোরের কখন কি নিবৃত্তি আছে?”

আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় এই সকল গানের মূল্য ধর্ম্মের দিক্ দিয়া স্বীকার করিবেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু বঙ্গদেশে প্রেমের পথে সাধকের অভাব নাই। পল্লীর কুটিরে এখনও বৃদ্ধ বৈষ্ণব একতারা লইয়া এই ধরণের গান গাহিয়া কাঁদিয়া বিভোর হন। সোণার পুতুল রাই-এর কষ্টে তাঁহার প্রাণ বিগলিত হয়। গৌরাঙ্গকে কৃষ্ণ একবার দেখা দিয়া পুনরায় অদৃশ্য হইয়া যত কাঁদাইয়াছেন—সেই কথা

তাহার মনে পড়ে। সে ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যের বিশুদ্ধ লীলার স্বাদ আমরা কোথায় পাইব?—যাহা খড়-কুটোকে সিঁড়িরূপে ব্যবহার করিয়া ভক্তির রাজ্যে পৌছাইয়া দেয়!

আর একবার গোপী কৃষ্ণকে পরিহাস করিয়াছিল, তাহা বড় কষ্টে। ডাক্তার আসিয়া মুমূর্ষ রোগীকে দেখিয়া যেরূপ মনের অবিশ্বাস ঢাকিয়া একটু হাসে, এই পরিহাস-রস সেই হাসির পর্য্যায়ে। চন্দ্রা কৃষ্ণকে আনিতে মথুরায় গিয়াছে। কৃষ্ণ বৃন্দাবনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। দূতী তখন যে-সকল ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছিল, তাহা মর্ম্ম-বেদনায় ভরপুর, হাসির ছদ্মবেশে মর্ম্মান্ত দুঃখের অশ্রু। রাধার কথা বলিতে যাইয়া গোপী বলিতেছে—

"যে গেছে—তার সবই গেছে, কুল গেছে—মান গেছে,
রূপ গেছে, লাবণ্য গেছে, প্রাণ যেতে বসেছে।
তায় তোমায় কি ব'য়ে গেছে, আরও বিষয় বেড়েছে।
পাঁচ পদে যে ব্যাপার করে, এক পদে যদি সে হারে,
হানি কি সে জানতে পারে?"
"দেখে আমার ব্রজের কথা মনে পড়েছে আজ,
সে কথা শুনাই তোমা বল রস রাজ!"
"ছিল ধেনু গোপের পাড়া—
এথা কত হাতী-ঘোড়া;
সেখানে পরিতে ধড়া,
এথা কত জামা জোড়া,
রাই-পদে লুটান-মাথায় পাগড়ী পড়েছে তেড়া।
ছিলে নন্দের ধেনুর রাখাল,
তারপরে রাই রাজার কোটাল,
একা এসে হয়েছে ভূপাল।"

এই সকল তীব্র-মর্ম্মবেদনার শ্লেষ। কিন্তু চন্দ্রা শেষে কৃষ্ণ-পরিত্যক্ত বৃন্দাবনের যে চিত্র উদ্ঘাটিত করিল, তাহা মর্ম্মান্তিক—

"তুয়া সে রহলি মধুপুর,
ব্রজকুল আকুল—কলরব দুকুল—
কানু কানু করি ঝুর

যশোবতী নন্দ, অন্ধ সম বৈধত,
সখাগন, ধেনুগণ, সহসা উঠই না পার।
বেনুরব বিসরণ—বিসরণ নগর বাজার।
কুসুম তেজিয়া অলি, ক্ষিতিতলে লুঠই,
তরুগণ মলিন সমান।
সারী-শুক-পিক, ময়ুরী না নাচত,
কোকিলা না করতহি গান।
বিরহিণী-বিরহ কি কহব মাধব,
দশদিশ বিরহ হতাশ!
শীতল যমুনা জল, অনল সমান ভেল,
কহতহি গোবিন্দ দাস।”

রাধা-কৃষ্ণ লীলার অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্য জীবনের ঘটনা। বৈষ্ণবদের কাব্য-কথা বুঝিতে হইলে, চৈতন্যের জীবন-চরিত দিয়া বুঝিতে হইবে—তাহা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। কৃষ্ণ-পরিত্যক্ত বৃন্দাবন-চিত্রের সঙ্গে আর একটি চিত্র মিলাইয়া দেখুন—তাহা চৈতন্য-পরিত্যক্ত নবদ্বীপ। চৈতন্য তাঁহার প্রিয় পরিকর জগদানন্দকে পুরী হইতে শচী দেবীকে দেখিতে নদীয়ায় পাঠাইয়াছেন–

“নীলাচল হৈতে, শচীরে দেখিতে,
আইসে জগদানন্দ।
রহি কত দূরে, দেখে নদীয়ারে,
গোকুল পুরের ছান্দ।
লতা-তরু যত, দেখে শত শত,
অকালে খসিছে পাতা।
রবির কিরণ না হয় স্ফূরণ,
মেঘগণ দেখে রাতা।

শাখে বসি পাখা, মুদি দুটি আঁখি,
ফল জল তেয়াগিয়া।
ধেনু বুথে বুথে, দাঁড়াইয়া পথে,
কার মুখে নাহি রা।
নগরে নাগরী, কাঁদরে গুমরি,
থাকয়ে বিরলে বসি।
না মেলে পসার না করে আহার

কারো মুখে নাহি হাসি।”

“শুনি শচী আই, সচকিতে চাই,

কহিলেন পণ্ডিতেরে।

কহে তাঁর ঠাঁই আমার নিমাই।

আসিয়াছে কত দূরে।”

চন্দ্রার কথার উত্তরে কৃষ্ণের প্রত্যুত্তের একবার যাত্রায় শুনিয়াছিলাম। সে গানটি মনে নাই, কিন্তু তাহার ভাব এখনও ভুলিতে পারি নাই। তাহা বঙ্গের পরিত্যক্ত পল্লীর কথা পুনঃ পুনঃ মনে করাইয়া দিয়াছিল। প্রথম ছত্রটি মনে আছে; কৃষ্ণ বলিতেছেন—তুমি আমাকে যেতে বল্‌ছ, কিন্তু আমি—“আর কি ব্রজ তেমন পাব?”—আর কি রাখালেরা আমায় তেমনই করিয়া তাহাদের একজন ভাবিতে পারিবে? মথুরা-মধ্যে আসিয়া একটা ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছে—তাহা উত্তীর্ণ হইয়া আর কি ব্রজবাসীরা আমার সঙ্গে তেমনই ভাবে মেলা-মেশা করিতে পারিবে? আর কি গোচারণের মাঠগুলি তেমনই আছে? সখারা কি উচ্ছিষ্ট ফল হাতে লইয়া ছুটিয়া আসিয়া তেমনই করিয়া আমার মুখে দিতে পারিবে? আর কি মা যশোদা হাতে ননী লইয়া আমার জন্য তেমনই পাগলিনীর মত পথে দাঁড়াইয়া গোঠের দিকে চাহিয়া থাকিবেন? যে-ব্রজের রাখালকে দিয়া তোমরা দাসখৎ লিখাইয়া লইয়াছিলে, তাকে কি তোমরা তেমনই প্রেমের ভিখারী মনে করিয়া কটুক্তি করিতে পারিবে?

“আমি আর কি ব্রজ তেমন পাব?”

এই গানে ব্রজের সুরটি নাই। নিত্য-বৃন্দাবনের লীলা অফুরন্ত; মথুরা তাহা নষ্ট করিতে পারে নাই, বরং ঐশ্বর্য্য-ধাঁধা ঘুচাইয়া ব্রজের গভীর প্রেমকে আরও বড় করিয়া দেখাইয়াছে। নিত্য বৃন্দাবনের সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের উৎস কি কখনও ফুরাইবার ও শুকাইবার? পূর্ব্বোক্ত গানটি একান্ত আধুনিক—উহা আমাদের বর্ত্তমান কালের গৃহছাড়া হতভাগ্যদের জন্ম-পল্লীর কথা মনে জাগাইয়া দিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করে।

রাধাকৃষ্ণ-লীলার অধ্যায়ে অধ্যায়ে এইভাবে হাস্য-রসের চাটনির পর্য্যন্ত অধিবেশন হইয়াছে। দানলীলা, নৌ-বিলাস ও মানভঞ্জনের পালায় এই রস একান্ত বাস্তব জগতের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, অত্যন্ত প্রগাঢ় ভাবের ক্ষেত্রে ইহাদের জন্ম, সুতরাং তরল হাস্য ও চাপল্যের মধ্যে সময়ে সময়ে উচ্চাঙ্গের ভাবধারার সন্ধান ইহাতে দুর্ল্লভ হয় না—যেরূপ রূপার খনিতে কখনও কখনও সোণা পাওয়া অসম্ভব নহে। রাধার মান ভাঙ্গাইবার জন্য কৃষ্ণ কখনও

নাপিত-বধূ, কখনও দোয়াসিনী (যোগিনী), কখনও বনিকিনী, কখনও বা গায়িকার ছদ্মবেশে আসিয়াছেন, সেই সেই দৃশ্যে পাঠক অনেক আমোদ-প্রমোদর কথা পাইবেন। গোবিন্দ দাসের একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"গোরথ জাগাই শিঙা ধ্বনি শুনইতে
জটিলা ভিক্ আনি দেল।
মৌনী যোগেশ্বর মাথা হিলাইত,
বুঝল ভিক নাহি নেল।

জটিলা কহত তব কাহা তঁহু মাগত,
যোগী কহ ত বুঝই।
তেরি বধূ হাত ভিক্ হাম লওব,
তুরিতহি দেহ পঠাই।
পতিবরতা ভিক্ লেই যব যোগী বরত
না হোয় নাশ,
তাকর বচন শুনইতে তনু পুলকিত
ধাই কহে বধূ পাশ।
দ্বারে যোগীবর পরম মনোহর,
জ্ঞানী বুঝিনু অনুমানে।
বহত যতন করি, রতন ধারি ভরি,
ভিক্ দিহ তছু ঠামে।
শুনি ধনী রাই, 'আই' করি উঠল,
যোগী নিয়ড়ে নাহি যাব।
জটিলা কহত যোগী নহি আনমত,
দরশনে হয়ব লাভ।
গোধূম চূর্ণ পূর্ণ থারি পর কনক
কোটরি ভরি ঘিউ।
করজোড়ে রাই, লেহ করি ফুকরই
হেরি ঘর্ ঘর্ জীউ।
যোগী কহত হাম, ভিক্ নাহি লওব,
তুয়া বচন এক চাই।
নন্দ-নন্দন 'পর যো অভিমানসি,
মাপ করহ ঘরে যাই।
শুনি ধনী রাই চীরে মুখ কাঁপল,

ভেকধারী নটরাজ।

গোবিন্দ দাস কহ নটবর শেখর

সাধি চলল নিজ কাজ।”

এখন যেমন “জয় চৈতন্য নিত্যানন্দ” বলিয়া ভিক্ষা চাওয়া হয়, পূর্ব্বে “গোরক্ষ জাগ” শিঙ্গায় বাজাইয়া নাথ-যোগীরা তেমনই ভিক্ষা চাহিতেন। প্রাতে এই ‘জাগ’ শব্দ উচ্চারণ করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিবার একটা রীতি প্রচলিত ছিল, পক্ষীগুলিকেও এই বুলি আবৃত্তি করিবার জন্য শিক্ষা দেওয়া হইত (“রাই জাগ রাই জাগ শুক-শারী বোলে”—চণ্ডীদাস)। জটিলা ভিক্ষা দিতে গেলে মৌনী যোগীবর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, তিনি ভিক্ষা লইবেন না; তাহার কারণ এই, তিনি পতিব্রতার (এখানে অর্থ সধবার) হাতে ভিক্ষা লইবেন, বিধবার হাতে ভিক্ষা লইলে তাঁহার যোগীর ব্রত নাশ হইবে, তোমার বধূকে পাঠাইয়া দেও। এই কথায় জটিলা হৃষ্টা হইল (সাধুকে খুব সদাচারী মনে করিয়া)। পরপুরুষের কাছে ভিক্ষা লইয়া যাইতে হইবে শুনিয়া রাধিকা “আই” করিয়া বলিলেন, ‘ছিঃ, আমি ওর কাছে যাব না।’ জটিলা বলিল—আমি বুঝিয়াছি, যোগী জ্ঞানী ব্যক্তি, তুমি অন্য মত করিও না (দ্বিধাযুক্ত হইও না); ‘ঘর্ ঘর্ জীউ’ অর্থে ভিক্ষা দিতে যাইয়া তাঁহার জীউ (প্রাণ) স্পন্দিত হইতে লাগিল। “শুনি ধনি রাই—নটরাজ”,— রাধিকা এ-কথা শুনিয়া চোখ মিলিয়া চাহিতেই বুঝিলেন, ইনি ভেকধারী (ছদ্মবেশী) কৃষ্ণ, তখন স্বীয় আঁচলে মুখের হাসি ঢাকিলেন। “সাধি চলল নিজ কাজ”—নিজের কাজ সিদ্ধি হইয়াছে অর্থাৎ মানভঞ্জন হইয়াছে বুঝিয়া চলিয়া গেলেন।

মাঝে মাঝে এই সকল আমোদ-প্রমোদের কথা আমদানী করিয়া লেখকেরা কৃষ্ণ-প্রেমের মধ্যে গূঢ় নাট্যরসের অবতারণা করিয়াছেন।

ইহা ছাড়া নানা কাব্য-কথায় অলঙ্কৃত হইয়া এই সাহিত্য চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। বিদ্যাপতির “নয়ন যে জনু খির ভৃঙ্গ আকার, মধু মাতল কিয়ে উড়ই না পার” (রাধার চক্ষু স্থির ভ্রমরের ন্যায়, যেন মধুভাণ্ডে পড়িয়া ভ্রমরটি আটকাইয়া গিয়াছে—উড়িতে পারিতেছে না)—ভাবাবিষ্ট চক্ষুর কি সুন্দর বর্ণনা! এই কবির “চঞ্চল লোচনে বঙ্ক নেহারণী, অঞ্জন শোভন তায়; জনু ইন্দীবরে পবন ঠেলল অলি-ভরে উলটায়” (কজ্জ্বলযুক্ত চক্ষুর অপাঙ্গ দৃষ্টি—চক্ষের তারা এক কোণে সরিয়া পড়েছে। যেমন ভ্রমর-পদ-পীড়িত নীলোৎপলকে পবনে ঠেলিয়া ফেলিতেছে)। চণ্ডীদাসের—“চলে নীল শাড়ী, নিঙাড়ি নিঙাড়ি—পরাণ সহিত মোর”, রায় শেখরের—“তুঙ্গমণি-মন্দিরে বিজলী ঘন সঞ্চরে, মেঘরুচি বসন পরিধানা” প্রভৃতি শত শত পদে অপূর্ব্ব কবিত্ব ফুটিয়াছে। আবার কোন কোন পদে কবিত্বের সঙ্গে অধ্যাত্ম-মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে, যেন বনের ফুল দেবতার নৈবেদ্যে স্থান পাইয়াছে। জ্ঞানদাসের—

"রূপ লাগি আখি ঝুরে, গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগ্নি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর,
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে,
পরাণ পীরিতি লাগি স্থির নাহি বাঁধে।"

কে যেন জোড় ভাঙ্গিয়া বেজোড় করিয়া দিয়াছে, গল্পকথিত গ্রীক দেবতার ন্যায় কে যেন অখণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছে, সেই দুই খণ্ড পরস্পরের সঙ্গে জোড়া লাগিবার জন্য বিরহে হাহাকার করিতেছে। জীব যাঁহার অংশ—তাঁহার বিরহে মন ব্যাথাতুর হইয়া আছে। যেরূপ সারাদিন সূর্য্যের মত রশ্মী পৃথিবীতে আসিয়া ছুটাছুটি করে, কিন্তু সন্ধ্যায় সূর্য্যের সঙ্গে মিলিত না হইয়া পৃথিবীর মাটিতে পড়িয়া থাকে না—সেইরূপ জীব তাঁহাকে ছাড়া যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ দশ ইন্দ্রিয় দিয়া হাতড়াইয়া তাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। শেষে "পরাণ পীরিতি লাগি স্থির নাহি বাঁধে"—তাঁহার প্রেম ছাড়া প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে। এইরূপ আর একটি গান আছে, তাহা লোচন দাসের। বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের দপ্তরে তাহার একটা ব্যাখ্যা দিয়াছেন, উহা তাঁহার মত মনস্বী ও সাহিত্য-রস-বোদ্ধার যোগ্য, কিন্তু তাহা ঠিক বৈষ্ণবের মত নহে—

"এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে ব'স,
আজি নয়ন ভরিয়া তোমা দেখি।

আমার অনেক দিবসে, মনের মানসে
তোমা ধেনে মিলাইল বিধি।
মণি নও মাণিক নও যে হার করি গলায় পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
আমায় নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।
তোমায় যখন পড়ে মনে, আমি চাই বৃন্দাবন পানে,
এলাইলে কেশ নাহি বাঁধি।
রন্ধন-শালাতে যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,
ধোঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।"

রামানন্দ রায়ের সুবিখ্যাত পদ "সো নহ রমণ, হাম নহ রমণী"টির যে লক্ষ্য—এই গানটি তাঁহারই বিবৃতি। নারী ও পুরুষের যৌন-সম্পর্ক ছাপাইয়া উঠিয়াছে, এই গীতিটি তাহার কামগন্ধহীন প্রেম-গৌরবে। এই যৌন-ভাবই আমার সঙ্গে তোমার

মিলনের বাধা। তুমি পুরুষ, আমি নারী,—খুব কাছাকাছি-রূপে মিশিতে পারি না। যদি তাহা না হইয়া তুমি ফুল হইতে, তবে তোমায় মাথায় পরিতাম, মণি-মাণিক্য হইলে গলায় হার করিয়া পরিতাম—লোকনিন্দা আমাগিদকে ছুঁইতে পারিত না। অন্ততঃ আমি রমণী না হইয়া যদি পুরুষ হইতাম, তবে একদণ্ডও তোমাকে সঙ্গছাড়া করিতাম না, "লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ" কেহ নিন্দা করিতে পারিত না।

এই প্রেমে যৌনভাব আদৌ নাই—কেবল সঙ্গ-সুখের কামনা, বরং বাহিরের স্ত্রী-পুরুষ-রূপভেদ মিলনের বিঘ্ন ঘটাইতেছে! ইহারা এই দেশের লোক—যেখানে স্ত্রী নাই, পুরুষ নাই, আছে শুধু বিশুদ্ধ, লালসালেশহীন প্রেম এবং চিরমিলনের আকাঙ্ক্ষা; দেহটা একটা বাধা মাত্র।

ইহাই চৈতন্যের অচিন্ত্য ভেদাভেদ। কতকদিন পর্য্যন্ত তিনি পুরুষ আমি নারী—তাঁহার সঙ্গে ভেদ জ্ঞান; কিন্তু পরে সম্পূর্ণ মিলনেচ্ছু প্রাণ নিজের সত্ত্বা লোপ করিয়া তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চায়,—তখন "অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেল মাধাই" (বি-প) কিম্বা "মধুরিপুরহং ইতি ভবেন—শীলা" (জ)। এই গানটিতে সেই অভেদ অবস্থার প্রাক্-সূচনা। "আমার নারী না করিত বিধি" কথায় বুঝা যাইতেছে, নারী তাহার নারীত্বের সমস্ত দাবী ছাড়িয়া দিয়া পুরুষকে চাহিতেছেন! এই কবিতা ভোগের কবিতা নহে, তবে যদি ইহাকে ভোগই বলিতে হয়—তবে বলিব "দেব-ভোগ"।

বৈষ্ণবেরা প্রেমের জগতে মৃত্যু স্বীকার করেন না। অনেক পদেই দেখা যায়, দশম দশায় রাধা কৃষ্ণের সঙ্গসুখ কামনা করিতেছেন। আসন্ন মৃত্যু, তখনও সখীদিগকে বলিতেছেন, মরিলে আমাকে তমাল ডালে বাঁধিয়া রাখিও (তমালের বর্ণ কৃষ্ণের বর্ণের মত), শ্যামলতা দিয়া বাঁধিও (নামের মিল-হেতু), "আমি হরি-লালসে পরাণ তেজব, তায়ে পাওব আন জনমে"—এইরূপ নানা পদেই দেখা যায়, মৃত্যুর পরও তাহার প্রাণ কৃষ্ণসঙ্গের ইচ্ছা ত্যাগ করিতেছে না; মৃত্যুর পর "আমার এ মৃতদেহ তার চরণেতে দিও ডালি"—এই প্রেম পরমানন্দময়, রাধার মৃত্যুও তাঁহাকে আনন্দপথের যাত্রীস্বরূপ চিত্রিত করিতেছে। আর একটি মাথুরের পদে রাধা বলিতেছেন, "আমার গলায় হার নিকুঞ্জে রহিল, তিনি ফিরিয়া আসিলে যেন একবার ইহা নিজের গলায় পরেন। বড় সাধ করিয়া নিজের হাতে মালতী ফুলের চারা পুঁতিয়াছিলাম, কিন্তু যখন ফুল ফুটিবার সময় হইবে—তখন আর আমি থাকিব না; তোমরা আমার হইয়া মালতী ফুলের মালা গাঁথিয়া তাঁহার গলায় পরাইয়া দিও।" কৃষ্ণকে সেবা করিবার ইচ্ছা ও সঙ্গলিপ্সা মৃত্যু-পথযাত্রীর অন্তিম-দশাকেও আনন্দের পুষ্পে পুষ্পাকীর্ণ করিতেছে। এই সকল পদে রাধা মৃতা ও মৃতপ্রায় নহেন,—অমৃতের অধিকারিণী।

পূর্ব্বোক্ত পদটি নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—

“কহিও কানুরে সই, কহিও কানুরে,
পিয়া যেন একবার আইসে ব্রজপুরে।
নিকুঞ্জে রহিল এই হিয়ার হেম-ছায়,
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার।
রোপিনু মল্লিকা, নিজ করে,
গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে।
তরু-ডালে রইল মোর সাধের শারী-শুকে,
মোর কথা পিয়া যেন শোনে তাদের মুখে।
এই বনে রহিলি তোরা যতেক সজনী,
আমার দুখের দুখী জীবন-সঙ্গিনী।
শ্রীদাম, সুদাম আদি যত তার সখা,
তা সবার সাথে তাঁর হবে পুনঃ দেখা।
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী
উঠিতে বসিতে তার নাহিক শকতি।
পিয়া যেন তারে আসি দেয় দরশন,
কহিও কানুর পায় এই নিবেদন।
শুনিয়া ব্যাকুল দুতী চলে মধুপুরে,
কি কহিবে শেখর বচন নাহি স্ফুরে।”

আর একটি পদে আছে—

“যাঁহা পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত।
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি গাহ,
হাম ভরি সলিল হইয়ে তছু মাহ।

যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ,
হাম অঙ্গ জ্যোতি হইএ তছু মাহ।
যে বীজনে পহ বাঁজই গাত,
মঝু অঙ্গ তাহে হইএ মৃদু বাত।
যাঁহা পহুঁ ভরমহি জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইএ তছু ঠাম।” (গো)

কানুর সঙ্গে মিলিত হইবার আশা মরণান্তেও তিনি ছাড়েন নাই। মরণের পরেও এই দেহ দিয়াই তাঁহার সেবা করিবেন—ইহাই তাঁহার কামনা। তাঁহার অরুণ পদ যে-পথে হাটিয়া যাইবে, আমার অঙ্গ যেন সেই পথের মাটী হইয়া থাকে। যে-সরোবরে তিনি নিতি নিতি স্নান করেন, আমি যেন তাহার সলিল হইয়া তদঙ্গ স্পর্শ লাভ করি। যে ব্যজনী তাঁহার অঙ্গে বাতাস দেয়, আমি যেন সেই ব্যজনী-সঞ্চালিত মৃদু বায়ু হইয়া তাহার সেবা করি। যে-মুকুরে তিনি তাঁহার মুখ দেখেন, আমি যেন সেই মুকুরের দীপ্তি হইয়া থাকি। যেখানে যেখানে তাঁহার মূর্ত্তি শ্যামল মেঘের মত উদিত হইবে, আমার অঙ্গ যেন সেখানে সেখানে সেই মেঘাবলম্বী আকাশে পরিণত হয়।

অর্থাৎ আমার দেহের পঞ্চ উপাদান—ক্ষিত্যপতেজমরুদ্ব্যোমে—যেন মৃত্যুর পরেও সেবকের মত তাঁহাকে ভজনা করে!

এই বৈষ্ণব গানটির অনুকরণে পরবর্ত্তী কালে শাক্ত কবি দাশরথি একটি গান রচনা করিয়াছিলেন, দুই-এর কতকটা এক ভাব, এক সুর।

“দুর্গে কর এ দীনের উপায়,
যেন পায়ে স্থান পায়।
আমার এ দেহ পঞ্চত্ব কালে, তব প্রিয় পঞ্চ স্থলে
আমার পঞ্চভূত যেন মিশায়।
শ্রীমন্দিরে অন্তর-আকাশ যেন মিশায়, এ মৃত্তিকা যায় যেন তব মৃত্তিকায়,

মা মোর পবন তব চামর ব্যজনে যেন যায়,
হোমাগ্নিতে মম অগ্নি যেন মিশায়।
আমার জল যেন যায় পদ্মজলে, যেন তবে যায় বিমলে,
দাশরথীর জীবন-মরণ দায়।”

এই গানটিতে বৈষ্ণব আত্ম-সমর্পণের ভাব থাকিলেও, অত্যন্ত দুঃখ, নিবৃত্তি বা মুক্তির ভাব কিছু আছে। বৈষ্ণবেরা আনন্দময়ের খেলার খেঁড়ু হইয়া থাকিতে চান, তাঁহারা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতে চান না। কিন্তু দাশরথী জীবন-মরণ—এই দুই হইতেই মুক্তি চাহিতেছেন। বৈষ্ণব যে আনন্দময় পুরুষবরের আনন্দের স্বাদ পাইয়াছেন, সেই পুরুষের সঙ্গ তিনি চিরন্তন কালের জন্য কামনা করেন। শাক্ত কিন্তু—‘যথা জলের বিম্ব জলে বিলয়’ সেই ভাবে আপনাকে ফুরাইয়া ফেলিয়া নিষ্কৃতি প্রার্থনা করেন—এই প্রভেদ।

গোবিন্দ দাসের আর একটি পদে সেই সুন্দর পুরুষবরের যে রূপ-বর্ণনা আছে, উহার প্রত্যেকটি অক্ষর হইতে কবিত্বের জ্যোতিঃ ফুটিতেছে। যে পদ দিয়া তিনি যান, তাঁহার চরণস্পর্শে সেইস্থলে স্থলপদ্ম ফুটিয়া উঠে। (যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চলই, তাঁহা তাঁহা খল-কমল খলই)। যেখানে তাঁহার ভ্রূভঙ্গিতে চঞ্চল কটাক্ষ খেলিয়া যায়,—"তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দহিল্লোল"। যেখানে তিনি প্রসন্ন দৃষ্টিতে চান—সেখানে যেন নীলোৎপল ফুটিয়া ওঠে। যেখানে তাঁহার মধুর হাস্য বিকশিকত হয় তাঁহা —"তাঁহা কুন্দকুমুদপরকাশ"।

বৈষ্ণব কবির মত ভগবানের অপূর্ব্ব রূপ আর কাহার চক্ষে এরূপ ভাবে ধরা পড়িয়াছে! আমরা রাধার পাদ-পদ্মের কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি, এই বিষয়ের কবিতাগুলি ভক্তি ও প্রেমে ভরপুর।

বংশীবদন লিখিয়াছেন—"না যাইও না যাইনা রাই বৈস তরুমূলে, অসিতে পেয়েছ ব্যথা চরণ-কমলে" সেই চরণ-কমলে একটা কুশাঙ্কুর ফুটিলে তাহা কৃষ্ণের প্রাণে শেলের মত বিঁধে।

"সিনান দুপুর সময়ে জানি
তপত পথেতে ঢালে সে পানি"

দ্বিপ্রহরে যমুনার সিকতাময় পুলিন রোদে তাতিয়া উঠে, রাধা কি করিয়া সেই উত্তপ্ত বালুকার পথে হাটিয়া স্নান করিতে আসিবেন! এজন্য কৃষ্ণ পূর্ব্ব হইতেই কলসী কলসী জল ঢালিয়া সেই পথ শীতল করিয়া রাখেন। রাধার প্রসাদী তাম্বুল পাইবার আশায় তিনি পথে হাত পাতিয়া থাকেন,

"লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই,
পদচিহ্ন তলে লুটে কানাই।
প্রতি পদচিহ্ন চুম্বয়ে কান,
তা দেখি আকুল ব্যাকুল পরাণ।"

এই পথে কৃষ্ণের অশিষ্টতা দেখিয়া যদি রাধা লজ্জা পাইয়া গৃহে প্রবেশ করেন, তবে কৃষ্ণ সেই পদ-চিহ্নের উপর লুটাইয়া পড়েন এবং প্রতিটি পদ চিহ্ন চুম্বন করেন। ইহা দেখিয়া আমার প্রাণ আকুলি ব্যাকুলি করিতে থাকে।

“সো যদি সিনাই আগিলা ঘাটে, পিছলি ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গের জল পরশ লাগিয়া যাহ পসারিয়া রয়,
বসনে বসন লাগিবে লাগিয়া, একই রজক দেয়,
আমার নামের একটি আখর পাইলে হরিষে লেয়।
ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে লাগিয়া ফিরই কতই পাকে,
আমার অঙ্গের বাতাস যে-দিকে সে-দিন সে-মুখে থাকে।
মনের কাকুতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে,
পায়ের সেবক রায়-শেখর কিছু কহে অনুমানে।”

সম্মুখের ঘাটে রাধা স্নান করিলে, অপর দিকের ঘাটে কৃষ্ণের স্নান করিয়া দুই হাত বাড়াইয়া রাধার স্পর্শ-করা জলের জন্য প্রতীক্ষা করা, তাঁহার ছায়ার সঙ্গে নিজের ছায়া মিলাইবার জন্য ঘোরা-ফেরা, তাঁহার অঙ্গের স্পর্শে যে-কাপড়খানি পবিত্র হইয়া আছে, সেই বস্ত্রের সঙ্গে নিজের পরিধেয়ের একটু ছোঁয়াছুয়ি হওয়ার অপূৰ্ব্ব সুখের জন্য এক-রজকের নিকট কাপড় দেওয়া, কোন খানে রাধার নামের একটি অক্ষর পাইলে দুর্ল্লভ সামগ্রীর ন্যায় সেটিকে গ্রহণ করা, যে-দিন রাধার অঙ্গস্পৃষ্ট হাওয়া যে-দিকে বহিয়া যায়, সে-দিন সেই বাতাসের স্পর্শ-সুখের জন্য সারাদিন সেই-দিকে থাকা, ইত্যাদি প্রচেষ্টা পূৰ্ব্বরাগের প্রমত্ত অবস্থাসূচক, রায়শেখর বলিতেছেন—দেখা সাক্ষাৎ নাই, কথা-বার্ত্তার সুযোগ নাই, তথাপি কত প্রকারে যে কৃষ্ণ তাঁহার মনের আগ্রহ ব্যক্ত করেন, কবি তাহার কয়েকটি মাত্র অবস্থার কথা বলিলেন।

প্রেম এখানে শুধু কবিত্বের উৎস নহে, উহা দিনরাত্রের অপস্যা।

কৃষ্ণের মথুরা যাওয়ার ফলে রাধা ও সখিগণ মূর্চ্ছাপর। রাধার জীবন-সংশয়—এই কথা শুনিয়া চন্দ্রাবলী রাধার কুঞ্জে আসিলেন, আজ আর হিংসা নাই, ঈর্ষা নাই, ‘সম দুখের দুখিনী’ সকলে। আজ প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিন ফুরাইয়াছে। চন্দ্রা এতদিন ঈর্ষায় রাধার মুখ দেখেন নাই, আজ রাধার রূপ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন, কিন্তু রাধার এই রূপ বাহিরের রূপ নহে—যে রূপে তিনি কৃষ্ণকে এতটা মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে চন্দ্রাবলীর পার্শ্বে থাকিয়াও তিনি ‘রাধা!’ বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেন—ইহা সেই রূপ। যেখানে যেখানে রাধা তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমের লীলা দেখাইয়াছেন, সেই সেই খানে চন্দ্রা তাঁহার রূপ আবিষ্কার করিয়াছেন, অন্যত্র নহে—

“সে ধনী আছিল শ্যামেব হিয়ার হার—
বঁধূর হিয়ার হার আছ ধূলায় পড়ি গো—
মরি মরি হরি-বিরহে আজ কি দশা তাঁহার”

এখানে কৃষ্ণ তাঁহাকে নিজের গলার হারের ন্যায় মূল্যবান মনে করিতেন, এইজন্যই চন্দ্রাবলীর কাছে রাধার রূপের মূল্য ও তাঁহার জন্য এত আক্ষেপ।

"হায় গো অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি,
আলতা পরাত বঁধু, কতই বাখানি।
এ কোমল চরণে যখন চলিত হাটিয়া গো—
বঁধুর অনুরাগে গো,
হেন বাঞ্ছা হ'ত যে পাতিরে দেই হিয়ে।"

আল্‌তা পরাইবার সময় কৃষ্ণ সেই পদযুগ্মের রূপের কতই না ব্যাখ্যা করিতেন, এইজন্য সেই "অতুল রাতুল চরণ দুখানি" চন্দ্রার কাছে এত সুন্দর এবং যখন এই দুইটি চরণ-কমলে পথে হাটিয়া শ্যাম-দর্শনের জন্য রাধা যাইতেন, তখন চন্দ্রা সেই পথে বুক পাতিয়া রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন—যেন রাধার পায়ে পথের কাঁকর বা কাঁটা না বাজে।

চন্দ্রাবলী এই যে রাধার নিরুপম রূপ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা বাহিরের রূপ নহে, সে রূপ কৃষ্ণ-প্রেমের মধ্যে। এই রূপের গৌরব করিয়াই রাধা বলিয়াছিলেন— "আমি রূপসী তোমার রূপে" এবং চন্দ্রা বলিয়াছিলেন— "মরি, যে রাধার রূপ বাঞ্ছে শ্রীপাব্বর্তী, যাঁহার সৌভাগ্যশ্রী বাঞ্ছে অরুদ্ধতী"! চন্দ্রা রাধার রূপ দেখিতেছিলেন না, তিনি কৃষ্ণের প্রেমই দেখিতেছিলেন।

গৌর-চন্দ্রিকা

এই পদাবলী পড়িয়া পাছে কেহ ইহাতে সাধারণ নায়ক-নায়িকার ভাব আরোপ করিয়া বৈষ্ণবের স্বর্গকে বাস্তবের মাটীতে পরিণত করেন, এই আশঙ্কায় কীর্ত্তনের আসরে গৌর-চন্দ্রিকার সৃষ্টি। গৌরচন্দ্রিকা দিক্‌দর্শনী স্বরূপ, বিশাল পদ-সমুদ্রে নাবিককে ঠিক্-পথ দেখাইয়া লইয়া যায়—দিক্‌ভ্রান্ত হইতে দেয় না। একঘণ্টা কাল মূলগায়েন ও দোহারগণ খোল পিটিয়া ও মন্দিরা-করতাল বাজাইয়া—শ্রোতারা আসরে কি প্রত্যাশা করেন—তাহারই একটা মুখবন্ধ প্রস্তুত করেন।

পূর্ব্বরাগের পালা আরম্ভ করিবার আগে গৌরবিষয়ক এরূপ কোন গান উচ্চকণ্ঠে গাহিতে থাকেন—

"আজ হাম কি পেখিলু নবদ্বীপচন্দ্র,
করতলে করই বদন অবলম্ব।
পুনঃ পুনঃ গতায়ত করু ঘরপন্থ,
ক্ষণে ক্ষণে ফুলবনে চলই একান্ত।
ছল ছল নয়নে কমল সুবিলাস,
নব নব ভাব করত বিকাশ।
পুলক মুকুল বর ভরু সব দেহ,
এ রাধামোহন কছু ন পায়ল খেহ।"

চিত্রকর যেরূপ তুলির রং ঘষিয়া ঘষিয়া রূপরেখায় একটী স্থায়ী বর্ণ তৈয়ারী করেন, সেইরূপ পুনঃ পুনঃ এই গানটি গাহিতে গাহিতে শ্রোতার মনে ভাবমুগ্ধ গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি স্থায়ীরূপে পরিকল্পিত হয়। গোরা আজ বড়চঞ্চল চিত্ত, একবার ঘরে একবার বাহিরে যাতায়াত করিতেছেন, তারপরে কি ভাবিয়া পুনরায় ফুলবনের দিকে একান্তে চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহার সজল চক্ষুদুটিতে পদ্মের মত দৃষ্টি নূতন নূতন ভাবে খেলিয়া যাইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে মনে আনন্দ উছিলিয়া উঠিতেছে এবং সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। এই ভাব কি—তাহা পদকর্ত্তা রাধামোহন ঠিক্ করিতে পারিতেছেন না।

এই চিত্র নব অনুরাগের ইহার ভাবে শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিয়া গায়েন মূলপালা অবতারণা করিবেন।

অথ শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ (চণ্ডীদাসের পদ)

"ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার, তিল তিল আসে-যায়,
মন উচাটন নিশাস-সঘন কদম্বকাননে চায়।
রাই এমন কেন বা হ'ল! সদাই চঞ্চল বসন-অঞ্চল সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি উঠই চমকি ভূষণ খসিয়া পড়ে।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে চণ্ডীদাসের কবিতায় রাধিকার যে অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, গৌর-চন্দ্রিকায় গৌরাঙ্গের সেই ভাবই সূচিত হইয়াছে। গৌরাঙ্গ করতলে বদন স্থাপনপূর্ব্বক মৌনাবলম্বন করিয়াছেন, রাধিকাও চণ্ডীদাসের পদে 'বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে না শোনে কাহারো কথা'। গৌরাঙ্গ 'পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করু ঘরপন্থ' রাধিকাও ঘরের বাহিরের দণ্ডে শতবার 'তিল তিল আসে যায়'। গৌরাঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে 'চলই ফুলবসন্ত কান্ত' এবং রাধিকাও 'মন উচাটন নিশাস-সঘন কদম্বকাননে চায়।' ইহা একই চিত্রের এপিঠ-ওপিঠ। গৌর-চন্দ্রিকার দ্বারা আসরের আব্‌হাওয়া একেবারে নির্ম্মল হইয়া যায়, তারপর রাধাকৃষ্ণ-লীলার অধ্যাত্মিক অর্থ ও ভাব পরিগ্রহ করিতে শ্রোতার কোনরূপই অসুবিধা হয় না। এই জন্যেই গৌরচন্দ্রিকা না গাহিয়া গায়েন কখনই রাধাকৃষ্ণ-লীলা আরম্ভ করেন না—পাছে লোকে লালসার কথা দিয়া এই লীলার ভাষ্য প্রস্তুত করে!

মান, মাথুর, খণ্ডিতা, গোষ্ঠ প্রভৃতি প্রত্যেক পালা গাহিবার পূর্ব্বে গৌর-চন্দ্রিকাটি এইরূপ—

"আজি না গৌরাঙ্গচাঁদের কি ভাব হইল,
ধবলী শ্যমলী বলি ডাকিতে লাগিল।
বেণু বিনা বাঁশী করিয়া সিঙ্গাধ্বনি,
হৈ হৈ রবেতে গোরা ঘোরায় পাঁচনি।"

এইখানে অদ্ভূত ব্যাপার এই, গোরা কেন ধবলী, শ্যামলী, প্রভৃতি নাম ধরিয়া গাভীগুলিকে ডাকিতে যাইবেন? তিনিও ব্রজের রাখাল নহেন। তিনি কেন পাচন-বাড়ি ঘুরাইতে যাইবেন? নন্দের ধেনুপাল চরাইবার জন্য তিনি ত নিযুক্ত নহেন! গায়েন ছোট ছোট গানের মধ্য দিয়া এই প্রশ্নের সমাধান করেন। কলির জীব বহির্ম্মুখ, তাহারা ইন্দ্রিয়াধীন পশু। তিনি আসিয়াছিলেন হরিনাম দিয়া মানুষের

পশুপ্রকৃতি ফিরাইতে। তাঁহার মুখের অবিরল হরি হরি ধ্বনি, বেণুবর, এবং তিনি যে হাতখানি উচ্চদিকে হেলাইয়া মানুষের প্রকৃত গম্যস্থান নির্দ্দেশ করিতেন—তাহাই পাচন-বাড়ির সঙ্কেত। একটু কষ্ট-কল্পনা করিয়া নদীয়ার তরুণ ব্রাহ্মণটিকে ব্রজের রাখালে পরিণত করিতে হয় বটে, তথাপি অবিরত হরি হরি রবে—গায়েনের ভক্তিগদগদ কণ্ঠের ধ্বনিতে করতাল, মন্দিরা ও মৃদঙ্গের শব্দে এবং গৌরহরির নাম পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তন-দ্বারা আসরের বিশুদ্ধি সাধিত হয় এবং কৃষ্ণের গোচারণ-পর্ব্বের আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করিবার জন্য শ্রোতৃবর্গের মনে তৎকালোচিত একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। কিন্তু মাথুর সম্ভোগমিলন ও রূপাভিসার প্রভৃতি পালায় চৈতন্য-ভাবের সঙ্গে রাধা-ভাবের এতটা স্বাভাবিক ঐক্য আছে যে, সেই সেই পালা গৌরচন্দ্রিকার সহিত একবারে মিলাইয়া যায়। গৌর-চন্দ্রিকায় "গৌর কেন এমন হৈল? স্বরূপ দে'খে যা রে—গৌর বুঝি প্রাণে মৈল!" এবং মাথুরের "রাই কেন এমন হৈল? ও বিশাখা, তোরা দেখে যা, রাই বুঝি প্রাণে মৈল" উভয়ের একবারে পার্থক্যহীন মিলনের ছন্দ রেখায় রেখায় মিল পড়িয়া যায়। সেখানে আর ওস্তাদ গায়নের উভয়কে মিলাইবার জন্য কোন রিপুকর্ম্ম করিতে হয় না।

বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস

বিদ্যাপতির প্রথম জীবনের প্রেরণা আসিয়াছিল জয়দেবের গীত-গোবিন্দ হইতে। বাক্যের পারিপাট্যে, ছন্দের ঝঙ্কারে এবং অলঙ্কার শাস্ত্রানুগত নায়ক-নায়িকার চিত্রাঙ্কণে রাজকবি বিদ্যাপতি দরবারী সাজেই দেখা দিয়াছেন। শিবসিংহ, লছিমাদেবী ও মিথিলার বড় বড় পণ্ডিতগণ তাঁহার শ্রোতা। কোন স্থানে শব্দের অপপ্রয়োগ ছন্দ ও কাব্যশ্রীর চ্যুতি বিচ্যুতি হইলে তিনি রেহাই পাইতেন না। বিদ্যাপতি স্বয়ং সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সংস্কৃতে অনেক কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন; রাজসভা-পূজিত পণ্ডিত বংশে তাঁহার জন্ম। তিনি স্থান কাল ও পাত্রের উপযোগীভাবে রাধাকৃষ্ণের লীলা গাহিয়া 'নবজয়দেব' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু চণ্ডীদাস নিজকে একজন পূজারী ব্রাহ্মণ (বাশুলী-পূজক) বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে কোনও উপাধি দেন নাই। বড়ু, দ্বিজ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া তিনি যে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—এইটুকু মাত্র জানাইয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা নকুলের কথা অনুসারে তাঁহাকে মহাপণ্ডিত বলিয়া মনিয়া লইলেও তিনি যে একেবারেই পাণ্ডিত্যভিমানী ছিলেন না—ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে। প্রথম বয়সের করিতায় কিছুকাল জয়দেবের লেখা মক্স করিলেও, অনতি পরেই সেই অনুকরণের প্রবৃত্তি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে স্বয়ং ভারতী দেবী পদ্মাসন পাতিয়া বসিয়াছিলেন এবং মুখে কবিতার ভাষা জোগাইয়াছিলেন। কাব্য-জগতে এই সিদ্ধি লাভ করিবার পর, সমস্ত কাব্যসংস্কার এবং কবিপ্রসিদ্ধির এলাকা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতি-রচিত পূর্ব্বরাগের বর্ণিত রাধা অলঙ্কার-শাস্ত্রের নায়িকা, বাহ্যরূপে ঢলমল। রাধা-নাম ও রাধা-ভাবের সঙ্গে আমাদের মনে যে পবিত্র লীলা মনে পড়ে এবং মানসী-পূজার জন্য যে নৈবেদ্য সাজাইয়া থাকি, বিদ্যাপতির পূর্ব্ব-চিত্রণে তাহার লেশমাত্র নাই। সহচরীরাও তাঁহার কর্ণান্ত-অবলম্বি কেশপাশ আঁচড়াইয়া বেণী বাঁধিয়া দিতেছেন, রাধিকা অতি গোপনে তাঁহাদের কাণে কাণে প্রেমলীলা সম্বন্ধে শিষ্ট-অশিষ্ট নানারূপ প্রশ্ন করিতেছেন; কখনও নবযৌবনাগমে তাঁহার দেহ-সৌন্দর্য্য-স্ফুরণের আভাস মুকুরে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। যেখানে কোনও প্রণয়ঘটিত কথাবার্ত্তা হয়, সেইখানে তিনি আনতমুখী হইয়া বাহ্যে উদাসীনতা দেখাইলেও, চৌর্য্যবৃত্তিপূর্ব্বক অতি আগ্রহে সে-সকল কথা শুনিতে থাকেন ("আনতমুখে ততহি দেহি কাণে"); এইভাব যদি ধরা পড়ে এবং কোন সখী তাহা প্রচার করিয়া দেয়, তবে একবারে রৌদ্রবৃষ্টি, ('কান্দন মাখি হাসি দেয় গারি') রাধা তখন মুখে হাসি এবং চোখে কান্না লইয়া সখীকে গালি দিতে থাকেন। কবি বলিতেছেন—'মনমত পাঠ পহিল অনুবন্ধ'—কামদেবের শাস্ত্রে নূতন পাঠ লইতেছেন। মোটকথা

রাধিকার পূর্ব্বরাগের ছবিগুলি সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের এক-একখানি পটবিশেষ। অভিসার ও স্নানের পর রাধিকার যে সকল চিত্র বিদ্যাপতি দেখাইয়াছেন, তাহা দেহসুখলোলুপ তরুণ-মনের উপাদেয় খোরাক। সেগুলি খুব সুনিপুণ কবির হাতের যোগ্য—কাব্যজগতে তাহা নিরূপম। কিন্তু তাহার উপমা ও উৎপ্রেক্ষা চোখে ধাঁধাঁ লাগাইলেও, সে চিত্র মেঘদূতের যক্ষীও নহে, কালিদাসের শকুন্তলাও নহে। ঐ দুই কবি কাব্যের উত্তরার্দ্ধে ভোগনিবৃত্তিজনিত প্রেমের নির্দ্দোষ পরিসমাপ্তি দেখাইয়াছেন। বিদ্যাপতির ভোগের চিত্র চিরকালই ভোগীকে লুব্ধ করিবে, কিন্তু চণ্ডীদাস হইতে কৃষ্ণকমল পর্য্যন্ত বৈষ্ণব কবিদের যে-সকল চিত্র আমরা দেখিয়াছি, তাহার অনেক পদই সংকীর্ত্তন-ভূমির রজঃ মাখা, তাহা মানব-হৃদয়ের চিরন্তন কারুণ্য ও সখাসঙ্গচ্যুত ব্যাথায় ভরপুর, তাহাতে সময়ে সময়ে ভোগের একটা বাহ্য রূপ আছে, কিন্তু তাহার মূল সুর—ভগবৎ প্রেম। কবিরা নারদ ও তুমুবরুর মত আমাদিগকে কৃষ্ণ-কথাই শুনাইয়াছেন, এই প্রেমে দেহের তাপ বা উষ্ণত্ব নাই—জ্বর-বিকারগ্রস্থ আত্মার অতৃপ্ত পিপাসা নাই। উহা উর্ব্বশীর নৃত্য নহে—বেহুলার নৃত্য; উগ্র চাঁপা ফুলের গন্ধ নহে, বাহ্য শুভ্রতাভিমানী বিষাক্ত ধুস্তর পুষ্প নহে,—উহা স্নিগ্ধ সুরভিপূর্ণ সজল নলিনীদল। চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগের চিত্রে রাধা প্রথম হইতেই নাম-জপের অধিকারিণী, তিনি মন্দিরের পূজারিণী—কুণ্ডলধারিণী, গেরুয়া পরিহিতা দুশ্চর্য্য তপস্যাশীলা আত্মহারা যোগিনী। তাঁহাকে বিশ্বের চতুর্দ্দিক হইতে কৃষ্ণবর্ণের আবেষ্টনী ভগবৎরূপের ধাঁধাঁ দেখাইতেছে। এই কৃষ্ণ-বর্ণের খেলা তিনি যেখানে দেখিতেছেন, সেইখানেই ভগবৎ সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়া প্রণাম করিতেছেন। এই ধ্যানশীলা, কেশ-পাশ বেশ-ভূষার প্রতি উদাসীনা, ক্ষণে ক্ষণে প্রিয়ের আগমনের ভ্রান্তিতে চমৎকৃতা রাধিকাকে দেখিয়া সখীরা বলিতেছেন, ইঁহাকে কোথায় কোন্ দেবতা আশ্রয় করিয়াছে? ("কোথা বা কোন্ দেব পাইল")। সত্যই তাঁহাকে কোনো দেবতা পাইয়াছেন, মানুষ আর তাঁহার নাগাল পাইবে না। তিনি সখিগণের সঙ্গে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া কথা বলিতে পারেন না—

> "দাঁড়াই যদি সখিগণ সঙ্গে,
> পুলকে ভরয় তনু শ্যাম পর-সঙ্গে। (প্রসঙ্গে)
> পুলক ঢাকিতে নানা করি পরকার (প্রকার),
> নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার।"

এই রাধার সুখ-দুঃখ মর্ত্ত্যের সুখ-দুঃখ নহে, তাহা অমর-ধামের সুখ-দুঃখ।

কিন্তু বিদ্যাপতির সব খানিই শুধু কবিত্ব বা অলঙ্কার-শাস্ত্রের পুনরাবৃত্তি নহে। চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল, পদ-কল্পতরুর অনেক পদে তাঁহাদের কথোপকথনের সারাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সাক্ষাৎকারের ফলে প্রেম যে অখণ্ড জিনিষ, সর্ব্ববর্ণের সংমিশ্রনের পরিণতি যেরূপ শ্বেত বর্ণ,—বাৎসল্য, সখ্য, ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি সমস্ত রসই একস্থানে যাইয়া মিশিয়া যায়—তখন ইহাদের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না, এই সকল কথা চণ্ডীদাস বিদ্যাপতিকে সম্ভবতঃ বলিয়াছিলেন। পদ-কল্পতরুতে বর্ণিত আছে, চণ্ডীদাস মৈথিল কবিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যৌন-লালসা হইতেই শুদ্ধ প্রেম হয়, কিম্বা প্রেমেরই স্বাভাবিক ক্রমে যৌনভাব শেষে আসিয়া পড়ে। বিদ্যাপতির প্রথম অধ্যায়গুলি সমস্তই অলঙ্কার-শাস্ত্রের অনুযায়ী, কিন্তু মাথুর ও ভাব-সম্মেলনে তিনি ভাবরাজ্যে বাঙালী বৈষ্ণব কবিদের মূল সুর ধরিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয়, এই পরিবর্ত্তন চণ্ডীদাসের সঙ্গে তাঁহার দেখাশুনার ফলে ঘটিয়াছিল। বিদ্যাপতি ‘মাথুর’ বর্ণনায় সেই রসের পরিপূর্ণ আস্বাদ আমাদিগকে দিয়াছেন। আমরা দেখাইয়াছি—“সোহি কোকিল অব লাখ ডাকউ”—পদটি তিনি চণ্ডীদাস হইতে গ্রহণ করিয়া পল্লবিত করিয়াছেন। তাঁহার ছিল অপ্রতিদ্বন্দী কবির ভাষা, সেই ভাষায় যখন তিনি মাথুর বর্ণনা করিলেন, তখন তাঁহার পদাবলীতে সমস্ত ভোগের চিহ্ন মুছিয়া গিয়াছে; তখন তিনি পবিত্র তিলক-কন্ঠী-ধারী বৈষ্ণবগুরু—“শ্রবণে হি শ্যাম করু গান, শুনইতে নিকলাউ কঠিন পরাণ”, তখন “শঙ্খ-করহুঁ দূর, ভূষণ করহুঁ চূড়, তোঁড়হি গজ-মতি হায় রে। শিখাঁক সিন্দুর, মুছিয়া করহ দূর, পিয়া বিনা সকলই আঁধার রে”—ইহাই তাঁহার ভাষা। তখন তাঁহার ভাব-সম্মেলনের “সখি আজি সুখের নাহিক ওর, চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর” প্রভৃতি গান বৈষ্ণবদের জপমন্ত্র হইল, চৈতন্যদেব সারারাত্রি গাম্ভীরায় স্বরূপের সঙ্গে এই সকল গান গাইয়া প্রেমের অপূর্ব্ব আস্বাদ পাইতেন।

চণ্ডীদাস একটি পদে বলিয়াছন, কৃষ্ণরূপের ধাঁধায় পড়িয়া আমার দেহ-মন একেবারে আত্ম-বিস্মৃত হয়, তখন চক্ষুর দৃষ্টি বর্ণ-বৈষম্য ভূলিয়া যায়, তিনি কৃষ্ণবর্ণ অথবা গৌর-বর্ণ, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। (“দেখিতে দেখিতে না চিনিয়ে কাল কিম্বা গোরা”)। কেহ কেহ এই পদটিতে গৌর আগমনের সূচনা বুঝিয়াছেন, এবং কেহ কেহ আবার তজ্জন্য উহা প্রক্ষিপ্ত মনে করিয়াছেন, কিন্তু কথাটা এরূপভাবে লিখিত হইয়াছে যে, তাহাতে স্পষ্ট ইঙ্গিত কিছুই নাই। কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত হইলে, প্রক্ষেপকারী এরূপ অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিতেন না, স্পষ্ট করিয়া বলিয়া ফেলিতেন। বহু পুরাণে বৈষ্ণবেরা চৈতন্য-আগমনের ভবিষ্যৎবাণীসূচক শ্লোক প্রক্ষেপ করিয়াছেন, তাহার সকলগুলিই স্পষ্ট সরল কথা, তাহাতে দ্ব্যর্থ কিছু নাই। কিন্তু চণ্ডীদাসের আর একটি পদে ইঙ্গিতটা স্পষ্টতর—“আজু কে গো মুরলী বাজায়—এতো কভু নহে শ্যাম-রায়—ইহার গৌর বরণে করে আলো”—এখানে গৌরাঙ্গের কথা কিছুই নাই; রাধা মুরলী-শিক্ষা উপলক্ষে কৃষ্ণের বেশ-ভূষা চাহিয়া নিজে পরিয়াছেন “তুমি লহ মোর নীল শাড়ী, তব পীত ধটা দেহ পরি” (বৃন্দা), চণ্ডীদাস এই রূপের কথাই বলিয়াছেন, সুতরাং

কথাটা সহজেই বোঝা গেল। কিন্তু এই সুদীর্ঘ পদটির শেষ-দুই পংক্তি গূঢ় অর্থ-ব্যঞ্জক—“চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে, এরূপ হইবে কোন দেশে?” এই গৌর মূর্ত্তির আর্বিভাব কোন্ দেশে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া কবি মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন, অর্থাৎ গৌরাঙ্গ যে আসিতেছেন, তাহার আভাস তিনি মনে মনে পাইয়া হৃষ্ট হইয়াছেন। এবার সমালোচকদের কেহ কেহ জোর গলায় বলিতেছেন, এই পদ প্রক্ষিপ্ত না হইয়া যায় না। কিন্তু ইংরাজীতে একটা কথা আছে, “Coming events cast their shadows before”, ভল্টেয়ার ও রসো যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, কিছু পরে নেপোলিয়ান সেইসকল কথার মূর্ত্তরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কবি ও দ্রষ্টাদের মনে ভবিষ্যাৎ ঘটনার এইরূপ প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে, তাহা ছাড়া সেই দুইটি পংক্তি যে নিশ্চিতরূপে গৌরাঙ্গ-আবির্ভাবের সূচক—তাহাই বা কিরূপে বলা যায়? রাধিকার বেশভূষা দেখিয়া কবি বলিতেছেন, এ আবার কেমন বেশ, এরূপ কোন্ দেশে পাইলে? তিনি হাসিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই ভাবের ইঙ্গিত পদটির পূর্ব্ব একটি ছত্রেও পাওয়া যাইতেছে—এ না বেশ কোন দেশে ছিল? অতিরিক্ত মাত্রায় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের অনুমানগুলিকে আমরা অনুমান বলিয়াই গ্রহণ করিব, সেগুলি সিদ্ধান্ত নহে। রাধাকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে চণ্ডীদাস এত কথা লিখিয়াছেন যে, শুধু এই দুটি পদে নহে, অনেক স্থলে টানিয়া বুনিয়া অর্থ করিলে তাহা চৈতন্য-আবির্ভাবের আভাস বলিয়া ধরা যাইতে পারে—তাঁহার সেই সেই পদে চৈতন্যের পাদক্ষেপের নূপুরধ্বনি শোনা যায়, কেবল অনুমান ও খামখেয়ালীর বলে এইসমস্ত পদ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। চণ্ডীদাসের আর একটি পদ এই:—

> “অকখন বেরাধি এ কহা নাহি যায়,
> যে করে কানুর নাম তার ধরে পায়।
> পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়,
> সোণার পুতলী যেন ধূলায় লুটায়।”

চৈতন্য দেব যাঁহার মুখে কৃষ্ণ-নাম শুনিয়াছেন, তাঁহারই পায়ে লুটাইয়া পড়িয়াছেন; তাই বলিয়া এই ধ্রুব-প্রহ্লাদ-নারদ-মাধবেন্দ্র পুরীর দেশে যে কৃষ্ণ-নামের এই মাহাত্ম্য সমস্তই চৈতন্যে আরোপ করিয়া কবির উক্তি প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে–বৈজ্ঞানিকের এই বাড়াবাড়ি তো অসহ্য!

অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার সম্বন্ধে চৈতন্যের বহু পূর্ব্ব হইতে এইদেশীয় লোকেরা অবহিত ছিলেন। কাহারও যদি কৃষ্ণ-নাম বলিতে রোমাঞ্চ হয়, কিম্বা কেহ যদি নির্জ্জনে তমাল তরুকে আলিঙ্গন করে (“বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল) তবে সে-সকলই

চৈতন্য-প্রভাবান্বিত, সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী কবির পদে ঐরূপ কিছু পাওয়া গেলে তাহা প্রক্ষিপ্ত—ইহা বলা সঙ্গত হইবে না।

চণ্ডীদাস প্রেম সম্বন্ধে কয়েকটি সার কথা বলিয়াছেন—তাহা অন্যত্র সুলভ নয়;

> “পীরিতি করিয়ে ভাঙ্গয়ে যে
> সাধন সঙ্গ পায়না সে।”

পরস্পরের প্রতি গভীর অন্যায় প্রমাণিত হইলে দাম্পত্য বর্জ্জননীতি সমর্থিত হয়। হিন্দুদিগের মধ্যে যদিও স্বামী স্ত্রীকে বর্জ্জন করিতে পারেন কিন্তু স্ত্রী স্বামীকে বর্জ্জন করিতে পারেন না। এই তালাকের ব্যবস্থা যে অন্যায় তাহা চণ্ডীদাস বলেন নাই। একজনকে বর্জ্জন করিয়া নূতন একজনকে গ্রহণ করিয়া অনেক স্থলে লোকে সুখী হইয়া থাকে। চণ্ডীদাস তাহাও অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, প্রেম-সাধনার পথে বর্জ্জননীতি একবারেই অচল। বর্জ্জন করিয়া অন্যকে গ্রহণপূর্ব্বক কেহ সুখী হইতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি প্রেমের সাধনা করিতে চান—তবে তাঁহার সঙ্কল্প বিফল হইবে। বর্জ্জনের আইন সাংসারিকের পক্ষে, কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সমস্ত দুঃখ-কষ্ট মাথায় লইয়া সেই পথে দৃঢ় থাকিতে হইবে। চন্দ্রের জ্যোৎস্না কন্টকের পথ দেখিয়া ফিরিয়া যায় না, সেই কন্টকের ’পরেই লুটাইয়া পড়ে; ফুলের গন্ধ বিষাক্ত স্থান দেখিয়া ফিরিয়া যায় না, তাহার প্রবাহ অব্যাহত থাকে। দানেই প্রেমের তৃপ্তি, সে দান একেবারে নির্ব্বিচার! সেখানে প্রেম পণ্যদ্রব্য নহে, দেওয়ার মধ্যে ফিরিয়া পাইবার কোন সত্ত্ব নাই, সে কেবলই দেওয়া। যাহাকে একবার ভালবাসিয়াছ—সে যেমনই হউক, তাহাকে চিরকাল ভালবাসিতে হইবে। হয়ত সংসারে এ-রকম নিষ্কাম প্রেমে অনেক সময়ে দুঃখ পাইতে হয়, কিন্তু যিনি প্রেমের সাধন-অঙ্গ খোঁজেন, প্রেম তো তাঁহার কাছে তপস্যা। সে তপস্যা ভাঙ্গিলে তাঁহার আর সাধনার পথে যাওয়া চলে না।

> “চণ্ডিদাস কহে পীরিতি না কহে কথা
> পীরিতি লাগিয়া পরাণ ত্যজিলে পীরিতি মেলয়ে তথা।”’

প্রেম ঘোষণা বা বক্তৃতা নহে। জগতের সমস্ত কষ্ট নীরবে সহ্য করিয়া প্রেমের জন্য যে প্রাণত্যাগ করিতে পারে—সে-ই প্রকৃত প্রেমিক।

"ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিয়া আছয়ে যে জন
কেহ না জানয়ে তারে,
প্রেমের আরতি জেনেছে যে জন
সেই সে চিনিতে পারে।" (চ)'

চণ্ডীদাসের মতে সুখ-দুঃখ, আশা নিরাশার মধ্য দিয়া যে পার্থিব প্রেমের মর্ম্ম বুঝিয়াছে, সেই মাত্র ভগবৎ প্রেম বুঝিবার অধিকারী—অন্য পথে তাঁহাকে পাওয়া যায় না।

"শুষ্ক কাষ্ঠসম দেহকে করিতে হয়।" (চ)'

দৈহিক ইন্দ্রিয়ের বিকার যতদিন থাকিবে, ততদিন প্রেমের আস্বাদ দুর্লভ। বহিরিন্দ্রিয়ের তথাকথিত রস শুকাইয়া গেলে, যখন দেহে সুখ-দুঃখ বোধ থাকিবে না, তখন প্রকৃত প্রেমের সন্ধান মিলিবে; তখন নিজের দেহের সুখ-দুঃখ বোধ থাকিবে না;—প্রিয়জনের সুখেই সুখ, তাহার দুঃখেই দুঃখ। কবি অন্যত্র বলিয়াছেন—

আমি নিজ সুখ দুখ কিছু না জানি"'

সাধারণ প্রেমে করাঙ্গুলি গুণিয়া গুণিয়া যদি বা কিছু দেওয়া হয়—তাহার বিনিময়ে প্রণয়ী কতটা পাইলেন সেই দিকে তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি থাকে, এক পাই কম হইলে অমনি প্রেমের পালা শেষ করিয়া ফেলেন। এবম্বিধ প্রণয়ীর পক্ষে দুঃখ-সুখ-বোধবিবর্জ্জিত 'শুষ্ক কাষ্ঠসম দেহ' সাধকের—প্রেমতত্ত্ব বোঝা একেবারে অসম্ভব।

"শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।" (চ)

এই পদটি সাধারণ পাঠকেরা অনেক সময়েই উদ্ধৃত করেন, কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁহারা অনেক সময়েই সহজিয়া বৈষ্ণবেরা ইহার যে অর্থ বুঝেন তৎসম্বন্ধে অজ্ঞ। 'মানুষ' অর্থ এইখানে যে-সে নয়। সহজিয়ারা মানুষ অর্থে এইখানে গুরুকে বোঝেন। তাঁহারা কোন দেবদেবী মানেন না। গুরুর বাক্যই তাঁহাদের কাছে বেদ। ইহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের সহজ-বাদের একটি সুত্র। নেপালে

হিন্দুদিগকে ‘দেভাজু’ ও বৌদ্ধদিগকে ‘গুভাজু’ বলে। ‘দেভাজু’ অর্থ দেবতার ভজনকারী এবং ‘গুভাজু’র অর্থ গুরুর ভজনকারী।

“চণ্ডিদাস কহে সুখ দুখ দুটি ভাই,
সুখের লাগিয়া যে করিবে আশ
দুঃখ যাবে তার ঠাঁই।” (চ)

খাঁটি প্রেম সুখ-দুঃখের উর্দ্ধের আনন্দলোক। সাংসারিক সুখ-দুঃখ দুটি যমজ ভ্রাতা। যেখানে সুখ আছে সেইখানেই দুঃখ। এই পদাবলীর মধ্যে উচ্চাঙ্গের সাধনা আছে, তাহা আমি বলিবার অধিকারী নহি; তাহা শুনিবার অধিকারও সাধারণ শ্রোতার নাই।

সহজিয়া বৈষ্ণবসমাজে অনেক ব্যভিচার হইয়া থাকে, কিছু দু’-একজন এরূপ দুশ্চর তপস্যাশীল সাধক আছেন—যাঁহার সংবাদ এদেশ ছাড়া অন্যত্র কোথাও পৌঁছায় নাই। যিনি মন্দ জিনিষটাই দেখিবেন তাঁহার কোনও লাভই হইবে না; ভগবানের শ্রেষ্ঠদান এই দুটি চক্ষু তাহা যেন খনির মধ্যে মণির সন্ধান করে; শুধু লোহা খুঁজিয়া কোনও লাভ নাই।

এই পদাবলী—সাহিত্যের স্ফুরণ হইয়াছে মহাপ্রভুর লীলায়। পৃথিবী এই যুগে রণদুন্দুভিনিনাদে বধির হইয়া আছে। কোন্ যুগে এই দিব্যসঙ্গীত জগতের প্রতি কোণে ধ্বনিত হইয়া স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিবে—তাহা জানি না। পৃথিবীর অন্য কোথাও শুধু এক মানব দেবতার রূপ ও গুণের আস্বাদ করিবার জন্য এরূপ বিশাল রসসাহিত্য—এরূপ অক্ষয় মধুচক্র রচিত হয় নাই। বৈষ্ণবকবিগণের প্রত্যেকের মধ্যেই ন্যূনাধিক পরিমাণে চৈতন্যের নামের ছাপ আছে। তন্মধ্যে শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকারের প্রতিটি পদেই গৌরাঙ্গের শীলমোহরাঙ্কিত, বাসুদেব ঘোষও চৈতন্যকথা ছাড়া কোনও কবিতা লেখেন নাই এবং কৃষ্ণকমল গোস্বামীর দিব্যোন্মাদ (রাই উন্মাদিনী) চৈতন্যচরিতামৃতের অঙ্কিত গৌরের ভাবাবিষ্ট মূর্ত্তি একেবারে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। সহস্র সহস্র লোক সেইসব গান শুনিয়া অশ্রুজলে ভাসিয়া গিয়াছে।

হে মহাভাগ, তুমি কে, কেন আসিয়াছিলে—জানি না। যোগীরা যাহাকে ক্ষণমাত্র ধ্যানে পাইয়া পুনরায় পাইবার জন্য যুগ যুগ তপস্যা করেন, তুমি কি সেই তপস্যার ধন? সংসারে ত কেবল স্ত্রী-পুত্রের ভালবাসার জন্য দিবারাত্র কাঁদিয়া থাকে, সন্ন্যাসীরা তোমাকে খুঁজিয়া বেড়ায়, সিদ্ধপুরুষেরা কতকগুলি অলৌকিক শক্তি অর্জ্জন করে—কিন্তু তোমার মত কোন্ যুগে কোন্ দেশে ভগবানের জন্য

এমন করিয়া কাঁদিয়াছে? নিজের মূর্ত্তিতে ভগবৎমূর্ত্তি কে এমন ভাবে অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছে এবং তোমার মত এরূপ প্রত্যক্ষ দর্শন পাইয়া কে উন্মত্ত হইয়াছে? তোমার অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে যাঁহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছিল—তাঁহাকে তোমারই মধ্যে বাংলাদেশ একবারমাত্র দেখিয়াছিল—সেই রূপের ছাড়া এখনও পদাবলীর স্বর্ণপটে লিখিত রহিয়াছে।

সমাপ্ত

🔸 Contributor 🔸

🤖 This ebook is auto generated using python from WikiSource (উইকিসংকলন) by bongboi. Thanks to the volunteers over wikisource:

- Bodhisattwa
- Jayantanth
- Mahir256
- Dr. Bir
- Sumita Roy Dutta
- কায়সার আহমাদ

🙂 Wikipedia has it's own epub generation system but somehow due to weird Styling and Font embedding those EPUBs invariably slows down the device in which you're reading. And Fonts get broken, some group members on t.me/bongboi_req reported this, so decided to build those concisely via Python.

✌️ Utmost care have been taken but due to non-survilance some ebook parts may be broken. If you find such please improve and submit or report to @bongboi_req. So that those can be improved in future

🔸 Disclaimer 🔸

⚠️

⚔️ Tele Boi does not own any content of this book. All the copyright is of respective authors/publishers of the books. @bongboi compiled this for Non-profit, educational and personal use, in favour of fair use.

🌏 The content of the book is publically available in the WikiSource.

🔥 Do Not redistribute in a commercial way.

✅ Please buy the hardcopy of the books to support your favourite authors and/or publishers.

🔸 সমাপ্তি 🔸

পড়ে ভাল লাগলে বই কিনে রাখুন।

🖤 করোনার প্রকোপের সময় বানানো বইগুলি। সবাই সুস্থ থাকুন, সুস্থ রাখুন।

🔊 Bengali Language have very few EPUBs created. @bongboi started creating this as a hobby project and made more than 2000 EPUBs at this stage.

🌟 Be a volunteer @bongboi or at WikiSource so that more ebooks become available to the public at large.

Help People Help Yourself ❤️

আরও বই ⏬

টেলি বই

MOBI